নিম্নবর্গের চেতনায় হিন্দু — মুসলমান সম্পর্ক, তাদের গান

সুধীর চক্রবর্তী

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, উচচবর্গ আর নিম্নবর্গ শব্দটা এখনকার শব্দ। আমরা যখন পড়াশোনা করেছিলাম, তখন এই শব্দটা বিশেষ শোনা যেত না। এই সমাজের দুটো ধাপ দুটো স্তর -- এইভাবে যে বিন্যস্ত হল, তার কারণ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা এই ধরনের কিছু কিছু ভাগ করতে আমাদের শেখালেন। যেদেশে আমরা বাস করি, ঘটনাচক্রে সেখানে ইংরেজ প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি রাজত্ব কর ার ফলে, কিছু কিছু ঔপনিবেশিক ভাবনাচিন্তা আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে। এদেশে যদি ইংরেজ না আসতো, তাহলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অন্যরকম হতো। ইংরেজরা এদেশে এসে--- ভদ্রলোক বলে একটা শ্রেণী, বাবু বলে একটা শ্রেণী ---এরকম সব বিভিন্ন শ্রেণী তৈরি কবে গিয়েছিলেন। তার ফলে একদল লোক---প্রিভিলেজড যাকে বলে--- সুযোগসুবিধা পেয়ে বাবু শ্রেণীর হয়ে গিয়েছিলেন, অ ারেক দল লোক প্রিভিলেজ না পেয়ে নিম্নবর্গে চলে গেছে। এমনিই দেশটা জাতিবর্ণে সংকীর্ণ। বহু রকমের বর্ণভাগ আছে আমাদের। হিন্দু-হিন্দুদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ--এমনিই খুব দীর্ণ আমাদেরসমাজ। তার মধ্যে আবার ইংরেজ এসে একটা নতুন বিভাজন করে আমাদের উচচবর্গে নিম্নবর্গে ভাগ করে দিয়ে গেছে।

এসব নানান সংকটের ফলে সমাজের পরিস্থিতি আজকে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যে, কোনো সংকট যখন দেখা দেয়, সেই সংকটের চেহারাটা আমাদের সামনে ঠিক পরিষ্কার ধরা পড়ে না। তখন খবরের কাগজ, চিন্তাশীল ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতারা ঝাঁ পিয়ে পড়েন সংকটের সমাধান করতে এবং ভদ্রলোকের মতো সমাধান করার চেষ্টা করেন উচচবর্গের চোখে, উচচবর্ণের চোখে। কিন্তু ত াতে সমাধান হয় না। সেটা ধরা পড়ল, বছর দুয়েক আগে কলকাতায় যখন হঠাৎ হিন্দু - মুসলমান দাঙ্গা বেধে গেল। ভদ্রলোকেরা, শিক্ষিত লোকেরা, রাজনৈতিক নেতারা ছোটাছুটি করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, অবিশ্বাস এত গভীরে যে, হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা যাচ্ছে না। শঙ্খ ঘোষ একটা রচনার মধ্যে লিখলেন, সম্পর্কই নেই, তার আবার সম্প্রীতি কী? এই কথায় তিনি আমাদের চেতনায় খুব বড়ো ঘা মারলেন। সম্পর্কই যেখানে নেই, সেখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি কী করে আসবে? সহাবস্থান হতে প ারে বড়ো জোর--- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সেই শান্তি কোনোভাবে বিঘ্নিত হলে আমরা গেল - গেল রব তুলি।

কিন্তু আমরা লক্ষ করলাম, সেই একই সময়ে, গ্রামে কিন্তু হিন্দু মুসলমানের কোনো দাঙ্গা হয়নি। এবং গ্রামেরলোক দিব্যি মিলে মিশে সেই সময়ে কলকাতা কিম্বা বম্বে শহরের মতো বড়ো মেট্রোপলিটন সিটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, গ্রামের লোক কিন্তু, হিন্দু মুসলমান--- বেশ পাশাপাশি সুন্দর বাস করছে, তাদের মধ্যে সম্প্রীতির কোনো অভাব ঘটেনি। তাহলে, কী সেই মন্ত্র, কী সেই ঘটনা , কী সেই বিন্যাস--- যার জন্যে গ্রামে দাঙ্গা হলো না, শহরে হল ? শহরের মানুষ শহুরে কায়দায় তার সমাধান করতে পারলেন না ?

এখান থেকে যদি আমরা আমাদের আলোচনাটাকে শু করি, তাহলে মূল সংকটের দিকে চলে যেতে পারি। প্রথমেই বলে রাখি যে, একেকটা সময়, একেকটা যুগ, একেকটা ইডিয়ম দিয়ে চলে। যেমন ধরা যাক, এখন বিংশ শতাব্দীর ইডিয়ম হচ্ছে সায়েন্স এ্যান্ড টেকনে ালজি। এখন সব কিছুই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দিয়ে আমরা মাপতে পারি। এটা বিংশ শতাব্দীর প্রবর্তন। কিন্তু মধ্যযুগে--- আধুনিক - পূর্ব যুগে--- যেটা ইডিয়ম ছিল, সেটা হচ্ছে রিলিজিয়ন বা ধর্ম। ধর্ম দিয়েই সব কিছু বোঝানো হত। আমাদের মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পড়লে দেখা যায়, যে ধর্মই সেখানে সব চেয়ে বড় কারক। সে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাহলে, আমরা প্রথমে বুঝে নিই যে, ধর্ম কথ াটার মানে কী এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম ব্যাপারটা কী ?

আমরা আলোচনার সুবিধের জন্য দুটো ভাগ করে নিলাম --- উচচবর্গের ধর্ম আর নিম্নবর্গের ধর্ম। উদাহরণস্বরূপ, উচচবর্নের ধর্ম বলতে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, তিনটে ধর্মকে আমি ধরলাম। মোটামুটি লোকে এই তিনটি ধর্মের মধ্যে থাকে। এই ধর্মগুলো কিন্তু একটা বড় ছাদ, অর্থাৎ আমাদের জীবনের কোনো সামাজিক, পরিবারিক, ব্যক্তিক সংকটে ধর্মই কিন্তু আমাদের ছাদের তলায় আশ্রয় দেয়। অ ামরা যখন খুব বিপন্ন হয়ে পড়ি, আমরা সেখানে প্রোটেকশন নিই। আমি যে শহরে থাকি, কৃষ্ণনগর শহর, সেখানে একবার দাঙ্গার অ াশংকা দেখা দিয়েছিল। বছর পাঁচ - ছয় আগে। তখন মুসলানদের--- খুব কমই মুসলমান ওখানে আছেন--- তাদের পাড়া থেকে তুলে এনে আমরা কতকগুলো স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই স্কুলে সেই মুসলমানরা থাকতেন, তাদের খাওয়ানো হতো, পাহারা দেওয়া হতো, যাতে দাঙ্গা না হয়। এই মুসলমানদের মধ্যে একজন ছিলেন রিকসাওয়ালা সুলতান খাঁ। তার সঙ্গে আমার বেশ চেনাজানা ছিল।

আমি পরে সব সংকট মিটে যাবার পর একদিন, সুলতান খাঁর রিকসায় যেতে যেতে গল্প করতেকরতে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমরা যে এখানে স্কুলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলে, তোমরা ওখানে কী আলোচনা করতে ? বলল, আমরা নিজেদের কথাই আলোচনা করতাম অ ার ভাবতাম যে, যদি আক্রমণ হয়, আমাদের কেউ মারতে আসে, আমরা কী করব? এটা নিয়ে বেশি আলোচনা হতো। তখন দেখা গেল যে আমরা বাংলাদেশে চলেযেতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের নেবে না, কারণ বাংলাদেশে ভারত থেকে কেউ গেলে তাকে স ম্পত্তি কিনতে দেয় না, জমি কিনতে দেয় না। পার্মানেন্টলি থাকার কোনো ব্যবস্থা সেখানে করে না। ফলে আমরা দেখলাম, বাংলাদেশে গেলে আমরা বাঁচবো না, আমরা খেতে পাবো না। তখন ঠিক করা গেল---, তারা সহজ সমাধান করল যে, ---আমরা সোজা--- একট া রাস্তা ধরে দেখিয়ে দিল, যে--- এই সোজা রাস্তা ধরে আমরা দৌড়ে চার্চে চলে যাবো। চার্চেগিয়ে বলব যে, আমাদের খৃষ্টান করে দ াও। খৃষ্টান হয়ে গেলে তাহলে তাদের আর হিন্দুরা মারবে না। এ রকম একটা আশ্চর্য সমাধানের কথা আমি কখনও ভাবি নি। কিন্তু ত ারা সামূহিকভাবে এই সংকটের সময়ে ভেবেছিল যে,একসঙ্গে খৃষ্টান হয়ে গেলে আমরা বোধহয় বেঁচে যাবো। এই বাঁচার চিন্তাটা যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তখন কোন্ পদ্ধতিতে বাঁচলাম, সেটা বোধহয় বড়ো কথা হয়ে ওঠে না। এর থেকে আমার চোখটা খুলে গেল, যে, ত াহলে মানুষ খুব বড়ো রকমের সংকটে পড়লে--- যে সংকটের মানে হচ্ছে প্রায় প্রাণটাই চলে যাবে--- সে রকম সময়ে এমন বিকল্প তারা খুঁজে নেয়, যে - বিকল্প স্বাভাবিক ভাবে মানুষ ভাবে না। এই থেকে আমার ধারণা হয়েছিল যে হিন্দু তাহলে একটা ছাতা, মুসলামান একটা ছাতা আর খৃষ্টানিটি একটা বড়ো ছাতা যার তলায় আমরা বেঁচে আছি।

যেমন ধরা যাক, কেউ যদি মুসলমান ধর্মে জন্মগ্রহণ করে, তার মৃত্যুর পর মোল্লা বা মৌলবিকে ডাকা হয়,জনাজার নামাজ পড়া হয়। সেই জানাজার নামাজ পড়ার পর তবে তার কবর হয়। এবং ঐ জানাজার নামাজ না পড়লে কবর হয় না, তার আত্মার মুক্তি হয় না। ক ারণ মুসলমাদের একটা বিশ্বাস হচ্ছে যে মৃত্যুর পর যে কবরস্থ করাহয় তাকে, সেই কবরে তাকে থাকতে হয় শেষ দিন পর্যন্ত। একদিন রে াজ কিয়ামতের দিন--- শেষ বিচারের দিন--- আসবে, তখন ইস্রাফিল শিঙা ফুঁকবেন, সমস্ত কবরের মানুষ উঠে আল্লার কাছে যাবে বিচ ারের জন্য ততদিন পর্যন্ত কবরকে রাখতে হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে কবরের মধ্যে কবরস্থ ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করতে হয়। হিন্দুদের যেহেতু এই ব্য াপারটি নেই, তাই কবরের যে সম্মান গুত্ব, সেটা আমরা হিন্দু হিসেবে ঠিক বুঝতে পারবো না। একজনের মৃতুরে পর মৌলবিকে ডাকা হল, জানাজার নামাজ পড়ার জন্যে। ---ঠিক এরকম ঘটেছিল আমাদের বাংলাদেশে --- যশোহরেরবিখ্যাত ধুয়ো গান গাইতেন পাগ্‌ল া কানাই--- তিনি যেহেতু ধুয়োগান গাইতেন, বাউল গান গাইতেন, তাই সমাজে নিন্দিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্ররা গিয়ে যখন মৌলবিকে বললেন যে, আমার বাবা মারা গেছেন, জানাজার নামাজ পড়তে হবে।--- মৌলবিরা কেউ তার নামাজ পড়েনি। খুব স ম্প্রতিকালে প্রয়াত বাংলাদেশের একজন লেখক আরজ আলি মাতুববর, তিনি খুব নিম্নবর্ণের মানুষ ছিলেন। সেই আরজ আলি একটু মুক্তমনা বৈজ্ঞানিকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচনাবলী বেরিয়েছে তিন১ ভল্যুমে বাংলাদেশ থেকে-- আরজ আলি রচনাসমগ্র । স ম্প্রতি সেটা পড়তে গিয়ে একটা জিনিস জানতে পারলাম। আরজ আলির চার বছর বয়সে বাবা মারা গিয়েছিলেন। তিনি খুব নি ম্নবর্ণের চাষী ছিলেন, লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু লিখেছেন যে, আমি বর্ণ পরিচয়, প্রথমভাগ, দ্বিতীয় ভাগ পড়েছিলাম, শিশু শিক্ষার দু একটি বই গিলে খেয়ে নিয়েছিলাম--- ঠিক এই ভাষায় লিখেছিলেন--- যে, চুষে চেটে গিলে খেয়ে নিয়েছিলাম। তারপর আর সারা জীবন পড়ার সুযোগ পান নি। এই আরজ আলি হাতে হাতে নানারকম ছোটখাটো জিনিসপত্র যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারতেন। তাঁর ক্য ামেরার খুব নেশা ছিল। তাঁর বাবা চার বছর বয়সে মারাগেছেন, মা অতিকষ্টে তাঁকে লালনপালন করার পর যখন মারা গেলেন, তখন, আমার এত প্রিয় মা, একটা ফটো আমি তুলব না--- বলে, মার একটা মৃতদেহের ফটো উনি তুলেছিলেন। এখন ইসলামের কোনে া প্রাণীর ফটো তোলা বা ছবি আঁকা নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ সেটা এখানে বিশেষ আলোচ্য নয়। ঘটনাটা আগে বলে নিই। ফটোতোলা নিষিদ্ধ কিন্তু আরজ আলি তাঁর মৃত মা-র একটি ফটো তুলেছিলেন। ফলে যখন জানাজার নামাজ পড়ার জন্য ডাকা হল মৌলবিকে, মৌলবি বললেন, পড়বো না। কারণ, তাঁর একটা তস্‌বির তোলা হয়েছে। তখন আরজ আলি মাদুববর বললেন, তস্‌বির তো তুলেছি আমি, অপরাধ তো আমার। যার ছবি তোলা হয়েছে, তিনি তো মৃত, তাঁর কোনো মতবাদ নেই, তাঁর মনোভাবের কথা আমরা জানি ন া। তিনি নিজে নামাজী মানুষ ছিলেন, সাত্ত্বিক মুসলমান ছিলেন। কিন্তু মৌলবি বা মৌলানা তা বুঝলেন না। তখন আরজ আলি ম াতুববর সেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক করলেন, কবর তো দিতেই হবে। অ-মুসলমানদেরর ডেকে কবরটা তিনি দিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা থেকে গেল যে,আমার মা-র তো মুক্তি হল না, সঠিক পদ্ধতিতে তাঁর জানাজার নামাজ হল না। তখন তাঁর মনে হল, আমার মা-র যদি মুক্তি না হয়, আর আমার মৃত্যুর পর জানাজার নামাজ পড়া হয়, তাহলে তো আমার মুক্তি হবে। কিন্তু মা-র তো মুক্তি হয় নি। অতএব তিনি সেখানেই ঘোষণা করলেন যে, আমি আমার এই দেহ আমার মৃত্যুর পর মেডিকেল কলেজে দান করলাম। এবং তিনি সেই দিন থেকে যুক্তিবাদী হলেন। সেই দিন থেকে তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সমস্ত শাস্ত্র পড়বার জন্য বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করবার চেষ্টা করলেন। এবং অর্জিত হল, যার ফলে আজকে আমরা দেখছি আরজ আলি রচনাসমগ্র বেরিয়েছে, যা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির পড়া দরকার, এইটা বুঝতে যে, ধর্মের আঘাত থেকে মানুষ কী করে যুক্তিবাদী হয়ে যায়। তাঁর জীবন থেকে আমরা সেটা শিখলাম। এ রকম জীবন থেকে মানুষ যখনকোনো উদাহরণ গ্রহণ করে, শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন সেটা এত পাকাপোক্ত শিক্ষা, পুথিগত শিক্ষার চেয়ে যে

উন্নতপর্যায়ের হয়--- বলবো যে-- জীবনপ্লাবী হয়ে ওঠে, যে, সেটা মানুষ কখনও ভোলে না।

এরকম একটা আমার নিজের জীবনের ঘটনা বলছি। আমি খবর পেলাম যে, আমাদের নদীয়া জেলাতে চারাতলা বলে একটা গ্রাম আছে। এই ঘটনার কথা আমি এক জায়গায় লিখেছি। সাধারণভাবে, মুসলমান গ্রামে যদি ঘোরেন, তাহলে দেখবেন, মুসলিমদের মধ্যে কতকগুলো বিদ্যা, জাতবিদ্যা--- নেই। যেমন, চাক ঘুরিয়ে মাটির খুরি তৈরি করা, হাঁড়ি কলসি তৈরি করার বিদ্যা মুসলমানদের মধ্যে কম। কামারের বৃত্তিটা খুব কম। ওরা বেসিক্যালি কামারের কাজটা করতে পারে না কোনো কারণে হিন্দুও নিশ্চয়ই অনেকগুলি কাজ পারে না। জাতিবিদ্যার দিক থেকেযদি সমাজকে ভাগ করা যায়, দেখা যাবে, হিন্দুদের নিজস্ব কতকগুলো স্পেসিফিক বৃত্তি আছে। তাই মুসলমান গ্রামে একজন দুজন হিন্দু থাকে এটা আমি ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে দেখেছি। গ্রামে যখন সমীক্ষা করতে গেলাম, প্রথমেই খোঁজ নিই, কজন লোক, কী বৃত্তান্ত। দেখা গেল সারা গ্রামে হয়ত দশহাজার মুসলমান আছে, কিন্তু এক ঘর হিন্দু কামার আছে। লাঙলের ফাল কাস্তে গড়তে হবে, বিদে তৈরি করতে হবে, লোহার যাবতীয় চাষাবাদের যন্ত্র দরকার, কোদাল চাই কুড়ুল চাই, একটা গ্রাম সমাজে বাস করতে গেলে যে জিনিসগুলো দরকার, সেগুলো কামারই করে দেবে। অতএব প্রত্যেক মুসলিম সোসাইটিতে কামারের খুব মান। আমি যে গ্রামের কথা বলছি--- চারাতলা গ্রাম --সেখানে একজন কামার ছিল। কামার ভদ্রলোক এসেছিলেন, যৌবনে, বিয়ে -তা করেছিলেন পাশের গ্রামে। সন্তান হয়েছিল গোটা দুয়েক। একদিন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে কল্যাণীতে জহললাল নেহ হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ছেলেটি ছোট,তার বয়স বছর কুড়ি হবে। সে কল্যাণীতে যাতায়াত করে। বাবার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে। একদিন গিয়ে --- ছেলেটি বলছে--- দেখলাম, হাসপাতালে ঢোকবার সময়ে কির-ম মনে হল--- ও গ্রাম্যভাষায় বললো--- আমার কির-ম গা বেজে উঠলো। কথাটার মানে হল, অমঙ্গল। ---তা গিয়ে দেখলাম, সত্যি সত্যিই বাবা মারা গেছেন। তখন আমি যাকাছে টাকা পয়সা ছিল, একটা ম্যাটাডোর ভাড়া করে বাবাকে গ্রামে নিয়ে চলে এলাম। এবার গাঁয়ের লোকরা--- যারাসমস্তই কিন্তু মুসলমান--- তারা বললো, তোমার বাবা মারা গেছেন, এখন কী করণীয় ? তার করণীয় হচ্ছে, গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে। এই বার যেটা ঘটলো, সেটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। চাঁদা তুলে ঐ ছেলেটিকে ডেকে আর দুটো লরি ভাড়া করে প্রায় দেড়শো জন মুসলামন ঐ ছেলেটিকে নিয়ে দেহটিকে নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে দাহ করলো। এবং হরিনাম দিল রাস্তায়। কারণ তারা জানে, হিন্দুকে যখন পোড়াতে হয়, তখন সৎকারের সময়ে হরিনাম করতে হয়। দাহ করার দশদিন পর যখন শ্রাদ্ধ হল তখন সেই বিধবাকে জিজ্ঞেস করা হল যে আপনার মনে কী বাসনা ? বিধবা বললেন যে শ্রাদ্ধের দিনে একটু কীর্তন হোক, এটা আমরা চাই। পাশের আরেকটু দূরের গ্রাম থেকে কীর্তনের দল ডেকে আনা হল এবং শ্রাদ্ধ শান্তি লোকজনকে খাওয়ানো হল, গ্রামবাসী সবাই খেলো। এই ঘটনা আমিএকটা ছোট্ট লোকাল কাগজে পড়ে কৌতূহলবশত চারাতলা গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। যারা এই সব কাজ করেছে,তাদের মধ্যে একজন লোককে আমি চিনতে পারলুম, তার নাম ইয়াকুব। সে আমাদের শহরে ডিম বিত্রি করতে আসে। আমি বাজারে মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে ডিম কিনি। কিন্তু আমি কোনওদিন সেই মানুষটাকে জানতামনা। একটা লোক গ্রাম থেকে যে ডিম বিত্রি করে খায়, আর আমি পয়সা দিয়ে কিনি, এর মধ্যে কোনো হৃদয়গত বিনিময় নেই, বস্তুগত বিনিময় খানিকটা ছিল। ওর মধ্যে ইয়াকুবকে দেখে আমি যেন খুব একটা চেনা লোক পেলামবলে মনেহল। আমি বললাম, ইয়াকুব তুমি কি এই শবযাত্রার সময়ে গিয়েছিলে নবদ্বীপের ঘাটে ? ইয়াকুব বললো,হ্যাঁ গিয়েছিলাম তো।--- তা তুমি কি হরিধবনি দিয়েছিলে ?--- হ্যাঁ হরিধবনি তো দিয়েছিলাম। --- তা তোমার কি এরপর ধর্মটা থাকলো ? তার উত্তর বললো, আমি ধর্মের দিকটা ভাবিনি। আমি মানুষের সৎকারের কথাটা ভেবিছিলাম। যা করা দরকার তাই আমরা করেছি। তাতে যদি আমাদের অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে, আর আমি যদি আর ততটা মুসলমান না হই, আমি যদি আজ থেকে হিন্দু হয়ে যাই, কী আর করা যাবে ? আল্লা নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তুআমার মনে হল, কাজটা আমরা ভালোই করেছি।--- ভালো যে করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ তো নেই। কিন্তু এত বড়ো দেশের এত বড়ো ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক, এত টিভি, এত জাতীয় সংহতি, কোথাও কিন্তু খবরটা বেরোয়নি। এই খবরটা যদি বেরোত, তাহলে আমাদের বাঁচবার একটা দিশা আমরা পেতাম। এবং এটাই বলতে চাইছিলাম যে, নিম্নবর্গের চেতনায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যদি বুঝতে হয়, বুঝতে হবে একদম গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের ভিতর থেকে। সেটাকে শহরের সমাধানের চোখ দিয়ে দেখলে কোনোদিন বোঝা যাবে না।

এই গ্রামভিত্তিক সমাজটা কী ? আমরা যে রকম করে কলকাতায় থাকি বা শহরে থাকি, আমাদের এই থাকাটাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলে দ্য ভার্টিকাল রাইজ। আমরা কেবলই ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছি আমাদের চেষ্টাই হচ্ছে কী করে ভার্টিকালি উঠে যাবো। এবং সেই লোকটির সবচেয়ে সম্মান, যে বেশ বহুতল বাড়িতে থাকতে পারে। কিন্তু আমার কিরকম মনে হয় যে, একতলা বাড়িতে থেকে, প্রাঙ্গণে একটা গাছপালা রোপণ করে, প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে, আমাদের একতলা বাড়ির বসবাস-- তার মধ্যে কিন্তু একটা প্রাণের স্পর্শ আছে, এবং বোধহয় এক ধরনের নন্দন আছে, বহুতল বাড়ির যে ছক, তার যে নিজস্ব স্পেস এরিয়া, তার যে নিজস্ব যৌথ ব্যবস্থা--- তার মধ্যেইথাকতে হয়। মানুষরা মেনে নেয়, মানতে মানতে মানুষ শেষ পর্যন্ত মেট্রোপলিটন মনের মানুষ হয়ে যায়। এবং খবরের কাগজ পড়ে, ঘুমোয়, খায়। এই মানুষগুলোর কাছ থেকে আমরা কোনো ঔদার্য আশা করতে পারি না। কিন্তু আমাদের বাউল গানে আছে যে, মানুষের যে উন্নতি, যে বিকাশ, তা কেমন হবে ? বাউলরা তো বড়ো বড়ো কথা কিছু বলেন না, খুব সহজ কথা বলেন। বলছে, দেখ,

জীবনে দুরকমের বাড় হয়। একটা হচ্ছে তালগাছের মতো বাড়, আরেকটা হচ্ছে বটগাছের মতো বাড় তালগাছের মতো যদি তুমি বাড় চাও, তাহলে ওপর দিকে উঠে যাবে। তোমার সঙ্গে মাটির সম্পর্ক থাকবে না। আর যদি বটগাছের মতো হও, তবে বিস্তারিত হবে। তোমার ঝুরি মাটিতে নেমে যাবে। সেখান থেকেই প্রাণরস তুমি শুষবে? বাউল তো বুঝিয়ে দিচ্ছে, কী সে চায়, কী তার বিকাশ হওয়া উচিত। আমাদেরও বিকাশ হওয়া উচিত বটগাছের মতো। এই বিকাশ শহরে হয় না, গ্রামে হয়। গ্রামে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। শুনলে অবাক হবেন যে, আমি যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যাই, তখন লক্ষ রাখি যে, --- একটামুদির দোকানে হয়ত বসে আছি, নিতান্তই গল্পগাছা হচ্ছে, একটি মেয়ে এলো, হয়তো একটা পোঁটলায় করে সে কিছুটা তিসি নিয়ে এসেছে--- সর্ষে জাতীয় শস্য--- এসে বলছে, বাড়িতে এই খানিকটা তিসি আছে, এই তিসিটা রাখুন,রেখে আমাকে কিছুটা কেরাসিন তেল দিন। আমরা অর্থনীতিতে যাকে বার্টার সিস্টেম বলতাম, অর্থাৎ একটা বস্তুর বিনিময়ে আরেকটা বস্তু। এর কোনো নির্ধারণ নেই কিন্তু। তিসি যতটা ছিল, ততটাই তেল পেলো কিনা সন্দেহ। সে বঞ্চিত হল। কিন্তু উপস্থিত তার হাতে কোনো টাকা নেই, তিসিটা আছে। এই তিসিটা দিল বলেই কেরোসিন তেলটা পেল। নির্ভরযোগ্যতা, নির্ভরতা--- এটা আমরা শহরে আশা করতে পারি না। শহরের দোকানে গিয়ে যদি আমরা বলি, যে আমাকে একটু কেরাসিন তেল দিন, আমি তিসি দিচ্ছি--- হবে না। সেখানে টাকা দিতে হবে। বিনিময়যোগ্যতার কী আশ্চর্য তফাৎ। এইবার, যদি একটা নৌকো বাইতে হয় আমাকে, সেই নৌকা কাঠ দিয়ে তৈরি করে দেবে যে কারিগর, তাকে আমার দরকার। ছুতোর যখন আমাদের পুরো নৌকো তৈরি করে দিল, নৌকোর মধ্যে যে ফাঁকগুলো আছে, সেই ফাঁক ভরাবার জন্য একরকমের রঙ করতে হয়, তাকে বলে গাবকালি। আঠা দিয়ে কেরোসিন দিয়ে নানারকম করে ওটা জুড়ে দিতে হবে। সেটা করার জন্যে এক ধরনের লোক আছে। তাদের ডাকতে হয়, তা না হলে নৌকাটা চলবেই না। এই নৌকোয় করে যে মাছটা খেতে হবে। আর সেই নৌকোর যে ধীবর, যে মাঝি--- লজ্জাবস্ত্র যেটা পরেছে, একটা মোটা আটহাতি কাপড়, সেটা গ্রামের তাঁতি বুনে দিয়েছে। কাজেই এইভাবে দেখা যায় যে, ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট রিলেশান্সিপ্স্। আমাদের যেটা মূল্য কথা, আমাদের যেটা নেই, আমাদের যেহেতু পকেটে নোটের গোছা আছে, আমরা কিন্তু অন্য কাউকেই প্রায় গ্রাহ্য করি না। আমাদের জীবনধারনের পক্ষে তারা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এটা আমাদের বিশ্বাস হয় না, কারণ আমাদের টাকা আছে। এই যে সব জিনিস কেনা যায়, শহরের জীবনে যে কেনার ক্ষমতা আমাদের আছে, ফলে একজন ধনী একজন দরিদ্র একজন মধ্যবিত্ত। কিন্তু গ্রামে প্রচুর টাকা আছে, তবু সে কিনতে পাবে না, যদি তাকে বয়কট করে। পাবেই না সে, কোনো জিনিস কিনতে পাবে না, গ্রামের লোক তাকে দেখাবেই না। সুতরাং গ্রামের এই যে বিকাশ--- বটের মতো, সবাই সবাইকে নিয়ে বেঁচে আছে। যেমন ধরা যাক, খুব সহজ কথা, আমাদের যখন এখানে, কলকাতা বা মফস্বল শহরে প্রচণ্ড বৃষ্টিতেজলপ্লাবিত হয়ে যাই, তখন আমরা যে জায়গাটায় যাওয়া যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিই। ঠনঠনে তো একবুক জল, ছোটবেলা থেকে শুনেছি, এটা আমরা দেখেছি আমাদের ছাত্রজীবনে যে, ওখান দিয়ে যাওয়া যায় না। থাক, এখন আর যাওয়া হল না। জলটা নামলে যাবো। কিম্বা অন্য কোনো পথ, কিম্বা রিকসাওয়ালাদের ডেকে টাকা দিয়ে কবুল করে আমরা পার হয়ে যাই। গ্রামে যদি আমরা যাই--- এই সেদিন আমি একটু গ্রামে গিয়েছিলাম--- বৃষ্টিতে মূল রাস্তাটা একদম জলের তলায় চলে গেছে। কী করি, অজানা লোক আমি, যাবো অন্য রাস্তায়--- দিশা জানি না। একজন মহিলা বসেছিলেন দাওয়ায়, ডেকে বললেন, ও ছেলে তুমি এই আমার দাওয়ার ওপর দিয়ে যাও। বললেন, তুমি যাবে কী করে, তোমার তো যাওয়া হবে না, তুমি তো আটকে বসে থাকবে, তুমি আমার দাওয়ার ওপর দিয়েই চলে যাও। এই যে দাওয়ার মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার আহ্বান, সে যে করতে পারলো, এই আহ্বানটা কিন্তু আমরা করতে পারি না। এটা আমাদের অনুদারতা, সংকীর্ণতা। ওযে ও ছেলে বলে আমায় সম্বোধন করল, সম্পূর্ণ অজানা এই মানুষটিকে এবং তার দাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমি দিব্যি চলে গেলাম, গ্রামের ভেতরে, --- এটা হচ্ছে ইন্টারডিপেনডেন্ট সোসাইটি যাকে বলে। এটা ছাড়া আর কোনো পথ গ্রামের নেই। ফলে গ্রামের কোনো একটা প্রান্তে যদি অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায় হঠাৎ---আগুন লেগেছে শুনলে, আমাদের পাড়ায় আগুন লাগলে, আমরা প্রথমে খতিয়ে দেখি যে কতদূরে, তারপরই শুয়ে পড়ি--- কিন্তু গ্রামের লোকে দেখা যায়, আগুন লেগেছে মানেই কিন্তু সে একটা বালতি নিয়ে ছোটে। কারণ সে জানে যে এই আগুন আস্তে আস্তে পক্ষবিস্তার করে আমার বাড়ি অবধি চলে আসবে। এই যে জানা--- বৃষ্টিকে, আগুনকে, ধর্মীয় সংকটকে, পারস্পরিক অসুবিধার মধ্যে পরস্পরকে জানা, এইগুলো একটা আলাদা শিক্ষা। গ্রামীণ শিক্ষা--- আমি বলবো।জনার্দন চক্রবর্তী নামক বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর স্মৃতিভারে বলে একটি আত্মজীবনী লিখেছেন। জনার্দনবাবুর কাছে আমরা পড়েছিলাম এক সময়ে। আত্মজীবনীতে লিখছেন যে, ছোটবেলায় যখন আমি খুলনাতে থাকতাম, তখন হাতেখড়ি হয়, মুসলামান সমাজে ওটাকে বলে কাগজধরা। একটা কাগজের ওপর লিখে হাতের লেখা শু করতে হয়। আমরা যেশ্লেটে লিখতাম বা মাটিতে লিখতাম, সরস্বতী পূজোর দিন হাতেখড়ি হত। তো, কাগজ ধরার অনুষ্ঠান জনার্দনবাবুর যেদিন হল--- একজন মুসলমান ব্যক্তির কাছে ওঁর হাতেখড়িটা হল। বলছেন যে, আমার সেই মাস্টারমশাই , বাবা তাঁকে নিয়ে এলেন, যে, ইনি তোমার কাগজ ধরাবেন। তিনি প্রথমে কলম দিয়ে লিখলেন এলাহি ভরসা, তারপর লিখলেন শ্রীশ্রী দুর্গাসহায়। লিখে বললেন, প্রথম কথাটা আমার,দ্বিতীয় কথাটা তোমার, দুটো কথাই কিন্তু আসলে এক। জনার্দনবাবু লিখছেন, তাঁর আত্মজীবনীতে যে, একেবারে শিশু বয়সের এই দুটো কথা কানে বাজে যে এলাহি ভরসা কথাটা আমার আর শ্রীশ্রী দুর্গা সহায় কথাটা তোমার, দুটো কিন্তু আসলে একই কথা। আমরা যাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা

বলি, সেটা যদি একজন ছাত্রের মধ্যে ইনজেকট করে দেওয়া যায় ছোটবেলায়, তারা যদি বুঝতে পারে যে ঠিক আমি কোথায় আছি, কী অবস্থায় আছি---। এবার জনার্দনবাবু লিখছেন যে, একদিন রাত্রিবেলাপাশের গ্রাম থেকে আকবর কাকা এসেছেন। এসে বাবাকে ডাকছেন তুমিজেগে আছো নাকি ? তখন মধ্যরাত। উনি বললেন, কেন গো ? আকবর তোমার কী হয়েছে ? বলল, আমার মেয়েটার সূতিকাজ্বর হয়েছে। কবিরাজ বলছেন,কাঁচা দুধ চাই। কাঁচা দুধ আমাদের গ্রামে পেলাম না। তোমার তো একটা গ আছে, মনে পড়ে গেল। আমাকে একটু দুধ দেবে ? তা, বাবা বলছেন, দুধ কী করে দেব, আমি তো দুধ দুইতে পারি না। গোয়ালা সকালবেলা এসে দুধ দয়ে দিয়ে যায়। তাই তো , কিছু করতে পারলাম না আকবর। আকবর চলে গেলেন, কী আর করা যাবে, দেখি, মেয়েটা বোধহয় বাঁচবে না। আকবর চলে গেল--- জনার্দনবাবু লিখছেন--- বাবার শু হল পায়চারি। আচছা জনার্দন, একজন মানুষ তো ওটাকে দোয়। তুমি দেখেছ, কেমন করে দুইতে হয় ? আচছা আমরা চেষ্টা করলে কি পারব না? ---জনার্দন বলছেন--- আমি তখন স্কুলে পড়ি। ---ঠিক আছে,গর পা দুটো বেঁধে ফেলা যাক। দড়ি দিয়ে বেঁধে,অত্যন্ত কষ্ট করে, --- বাবা বললেন, না এটা করতেই হবে। বলে, সেই দুধটা দুইলেন, খানিকটা হল। এবার লণ্ঠনটা জ্বালো। লণ্ঠনটা নিয়ে চলো। লণ্ঠনটা জ্বেলে--- জনার্দনবাবু বলছেন--- আমি আর বাবা, প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, একটা সময়ে--- আকবর আছো নাকি? আকবর বললেন, কে ? বললেন, দুধটা দুইতে পেরেছি, জানো। মেয়েটা মরে যাবে, এটা কি ঠিক? গল্পটা আমাদের কি বলছে? গ্রামজীবনে বেঁচে থাকার যে আশর্চ্য উদ্ভাস, এই গল্পের মধ্যে সেটা আছে। সেখানে জনার্দনবাবুর বাবা মুসলমান কথাটা ভাবেন নি। এই জনার্দনবাবুকে আমি ক্লাসে পড়াবার সময়ে দেখেছি, যতবার, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস বলছেন, ততবার প্রণাম করতেন। মানে, এতদূর তিনি ভক্তিমান হিন্দু ছিলেন। কিন্তু ঐ বাবারই তো ছেলে। তাঁর মধ্যে অসম্ভব ঔদার্য ছিল, আমি লক্ষ করে দেখেছি। ধর্মীয় ঔদার্য যাকে বলে, ধর্মপালনটার সঙ্গে অন্যধর্ম সম্বন্ধে যে ঔদার্য, এটাকে আমি খুব বড়ো জিনিস বলে মনে করি।

নিম্নবর্গের কাছে আমরা যাই যখন, যখন মিশি, তখন আমাদের প্রতিদিনের এই শিক্ষিতের অহংকার ভেঙে যায়। এবং আমরা লক্ষ করি যে, মানুষ তার বাঁচার প্রক্রিয়ায় কি ভাবে সমাধান করে নিচ্ছে একটার পর একটা সংকট, একটার পর একটা সমাধান। দেখে আশর্চ্য হয়ে যেতে হয়। সেইটা বলতে গিয়ে আমি আপনাদের যে গল্পচছলে অনেকগুলো অভিজ্ঞতার কথাও বললাম, সেটা এইটা বোঝাতে যে, সমাধানটাকে যদি একটু সামনাসামনি আমরা দেখি, তাহলে বোধহয় সমাধানটা অনেক বেশি বুঝতে পারা যাবে। খুব জটিল আকারের কোনো পণ্ডিতের বইপড়ে, কোনো তাত্ত্বিক বই পড়ে বা পুঁথিগত ভাবে এ সমাধান বার করা যায় না। এবার দেখুন, প্রত্যেক ধর্মের নিজস্বএকটা ধরণ আছে। ধরা যাক, ইসলাম, তার যে পাঁচটা প্রধান কৃত্য--- মুসলমান যখন ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে বা জন্মাচ্ছে, তখন তার প্রথম যেটা আকিদা বা বিশ্বাস সেটা হচ্ছে এই, লা ইলাহা ইল্লালাহা মহম্মদ রসুল্লাহা--- অর্থাৎ আল্লাই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নন। একজন মুসলমান যখন এই কথাটিকে মানলেন, যদি তার কাছে একজন এসে বলে যে, ভীষন বসন্ত হচ্ছে, আমরা ঐ শীতলার পূজো করব। চাঁদা দিন। এই শীতলা পুজোরচাঁদা যদি একজন মুসলমান দেন, তিনি যে কাজটা করলেন, তাকে বলে সেরেকিকাজ--- কথাটার মানে হচ্ছে মুসিবতের কাজ--- আল্লার সঙ্গে আর একটা লোককেও স্বীকার করে নিলেন তিনি--- অংশীবাদ বা সেকেরি বা গোনাহ্, সেটা অন্যায় কাজ। একজন খাঁটি মুসলমানের সেটা করা উচিত না। মুসলমানেরদ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, পাঁচবার নামাজ পড়া। অন্তত একবার পড়া, অন্তত বছরে একবার পড়া, ঈদের দিনে। আমার মনে পড়ে গেল, বহরমপুরে একটি ছেলেকে পেয়েছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নাম শাজাহান, --- শাজাহান তুমি কি মুসলমান? আমি তো বুঝতেই পারছি সে মুসলমান । সে আমায় গণসঙ্গীত শোনালো। শুনে টুনে আমি বললাম, শাজাহান তুমি কি মুসলমান ? বলল, আমি ক্লাস এইট অবধি মুসলমান ছিলাম। আমি বললাম, ক্লাস এইট অবধি মুসলামান ছিলে, তারপর কি করলে ? বলল, কি করলাম জানেন, গত সপ্তাহে ঈদের নামাজ ছিল। আমি তো বহরমপুর শহরে থাকি। কাঁদি গ্রামের মদ্য আমার বাড়ি। সকালবেলা যখন এখান থেকে বেরচ্ছি, তখন আমাকে এখানকার মুসলমান মৌলানা বললেন যে শাজাহান তুমি আজ ঈদের নামাজ পড়েছো কোথায়? বললাম কাঁদিতে গিয়ে গ্রামের পড়বো। ভোরবেলা চলে গেলাম। যখন গিয়ে পৌঁছলাম, বেলা বারোটা। সেখানকার মুসলমান সমাজ জিজ্ঞাসা করলেন, শাজাহান তুমি ঈদের নামাজ পড়লে কোথায় ?--- কেন, বহরমপুরে পড়ে এসেছি। --- এই যে সংকট, ধর্মের সংকট, এটা কিন্তু হিন্দুদের নেই।ওই নামাজটা কোথায় পড়লো, তার জবাবদিহি করতে হবে তাকে। এবং ঈদের নামাজ কি তুমি পড়েছে, এটা একটা খুব বড়ো প্রশ্ন।

বীরভূমে সিউড়ী থেকে ছ-মাইল দূরে একটা জায়গা আছে, তার নাম পাথরচাপড়ি। সেখানে একটা মেলা হয় চৈত্রমাসে। দাতাসাহেব বলে একজনের নামে মেলা হয়। দাতাসাহেবের একটি সমাধি আছে. দাতা না, আসলে কথাটা হবে দাদা। মানে প্রিয় জ্যেষ্ঠ। হঠাৎ দাতা দাঁড়িয়ে গেছে, বা লোকের ধারণা থেকে দাঁড়াতে পারে। দাতা কথাটা মুখে মুখে দাতাপীরে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে নিম্নবর্গের মুসলমানরা গিয়ে সেই সমাধির ওপর একটা চাদর চাপিয়ে দেয়। এই চাদরের দাম--- আমি এবারই গিয়েছিলাম--- চল্লিশ টাকা থেকে আরম্ভ দামি চাদরের দাম পাঁচ হাজার টাকা। যার যেরকম ক্ষমতা, সে সেরকম চাদর কিনছে, কেউ কেউ শুধু চাদরটা কিনতেই দেখাবে যে আমার অনেক টাকা আছে। এবার সেই চাদরটা সেই সমাধির ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে। সেই চাদরের একটা সুতো দিয়ে মাদুলি করা হয়, তাহলে রোগ সেরে যাবে। সেই চাদরের টুকরো নিয়ে ফকিররা জামার কাপড় তৈরি করেন। তাদের গায়ে যে আলখাল্লাটা, তৈরি

করেন ঐ চাদর দিয়ে। এটা বিশ্বাস যে, দাতাপীরের আশ্রমে গেলে আমার সব সেরে যাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, দেখলে, ---এক দুই তিন চার করে গুনে দেখেছি আড়াই হাজার খঞ্জ অন্ধ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পঙ্গু--- কেন তারা সেখানে গেছে ? দাতাসাহেবের যদি অনুগ্রহ হয়, সুতোর কুচি যদি পাই, আমার রোগ সেরে যাবে।আমি যখন বাসে করে যাচ্ছি পাথরচাপড়ির মেলা দেখতে, একজন খানদানী মুসলমান বাসে বসে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আমি বললাম যে, পাথরচাপড়ির মেলায় যাচ্ছি।--- কেন যাচ্ছেন, ওটা খাঁটি মুসলমান মেলা নয় কিন্তু। আমি বললাম কেন? বললেন, ওখানে পীরকে বলা হচ্ছে বড়, পীর নাকি সারিয়ে দেবেন, পীর সব ঠিক ঠাক করে দেবেন। ঠিক করে দেবার ক্ষমতা এক আল্লারই আছে, পীরের তো নেই। ওখানে আপনার যাওয়া উচিত নয়। আমি বললাম, দেখুন আমি তো মুসলমান নই, আর আমার কৌতূহল আছে, আমি মেলাটা দেখতে যাচ্ছি। দেখলাম, দশ লক্ষ মুসলমান এসেছে। তারা কি কেউ মুসলমান নয় ? তখন লক্ষ করে দেখলাম, এরা অত কোরাণ পড়েনি। ওরা অত মৌলবি মৌলানার পাল্লায় পড়েনি। ওরা জীবনের সবচেয়ে সংকটের সময়ে কাকে আর খুঁজে পাবে? অনির্দিষ্ট আল্লার চেয়ে নির্দিষ্ট পীরের কাছে যাওয়া অনেক সহজ। ফলে সেইখানে তারা চলে গেছে। এই যে চলে যাওয়াটা, এর মধ্যে এমন একটা বেগ আছে, এত বিশ্বাস আছে, যে, সেই বিশ্বাসটাকে ঠিক লঙঘন করা যায় না।

ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলা হয়। সেখানে গিয়ে দেখেছি, কবে বহুদিন পূর্বে দুশো বছর আগে কে একজন আউলচাঁদ ফকির নাকি সেখানে এসেছিলেন। এসে রামশরণ পালের স্ত্রী সরস্বতী দেবী বলে একজনকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ডালিম তলার মাটি মাখিয়ে হিমসাগরের জলে চান করিয়ে তাকে সারিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এখনও পর্যন্তআজকে এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যদি আপনারা ঘোষপাড়ায় মেলায় যান, দেখবেন একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্ত কাকভোর থেকে শু করে দুপুর বারোটা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক দণ্ডী খাটছে। ডালিমতলার মাটি গায়ে মেখে হিমসাগরের জলে চান করছে। করলে নাকি খঞ্জ সেরে যাবে, অন্ধ সেরে যাবে, বোবা কথা বলবে, প্রতিবন্ধিতার অবসান ঘটবে। তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, জনে জনে জিজ্ঞেস করেছি, সত্যি কি সারে নাকি ? ---বিশ্বাস। একে বলে লোকবিশ্বাস। এর এতো বড়ো শক্তি আছে ! খোঁজ করে দেখলাম যে, এইখানে হিন্দুও এসেছে মুসলামানও এসেছে। বাংলাদেশ থেকে ফকিররা এসেছে। আর এই বিশ্বাসের জায়গাটা এমন জায়গা যেখানে কোনো হিন্দু মুসলমান ভেদআমি পাইনি। এটা খুব আশ্চর্য !

সুতরাং আমি বলব যে হিন্দু মুসলমানের বড়ো ছাতা যেটা, সে ছাতার তলায় আমরা আছি, আবার নেইও।যেমন ধরা যাক, নদীয়া জেলাতে চাপড়া বলে একটা গ্রাম আছে হিসেব করে দেখা গেল সেখানে একশো বছর আগে, একশো না দেড়শো বছর আগে, একটা প্রোটেস্টান্ট চার্চ হয়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গিয়ে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং অনেক লোককে কনভার্ট করেছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। তা সেই গ্রামটা, যে- গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেছিলেন, সে গ্রামটার নাম হচ্ছেদ্বীপচন্দ্রপুর। গিয়ে দেখলাম, সেই দ্বীপচন্দ্রপুরটা এখন জলের তলায় চলে গেছে। নদী তাকে গ্রাস করেছে। যে গ্রামেগেলাম চাপড়ায়, সেখানে গিয়ে দেখলাম, প্রায় দেড়শো বছর ধরে একটা খৃষ্টান মেলা হচ্ছে। খৃষ্টীয় মেলা কী ব্যাপার ? গিয়ে দেখলাম, কিছুই না, আমাদের মতোই মেলা। লোকেরা কেউ কেক খাচ্ছে না, সবাই পিঠে পুলি করেছে বড়দিনে, দাণ মেলা হচ্ছে। মেলার মধ্যে নতুনত্ব দেখলাম যে পশুপাখিরও মেলা হয়েছে। তাদের নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। ভালো পশুপালন করেছে যে, যার বাড়িতে ভালো ছাগল আছে, যে ভালো ভেড়াতৈরি করতে পেরেছে, তাদেরও কিন্তু একটা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য একটা প্রতিযোগিতা দেখলাম, যে ঐ গ্রামে গরীব মানুষদের মধ্যে যত ঠেলাওয়ালা যাকে বলে, ঠেলাগাড়ি চালায়, ঘোড়া দিয়ে চালায় সেই --- আমাদের শহরের সর্বত্রই তো আমরা ঐরকম এক্কাগাড়ি দেখি, ঘোড়া দিয়ে টানা হয় -- ওখানে, সেই ঘোড়াগাড়িরএকটারেস দেখলাম। এক্কাগাড়িও যে একটা রেস হয়ে, গ্রামের মধ্যে এই প্রথম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বোঝা গেল যেগ্রামের নিজস্ব যে চরিতার্থতা, নিজস্ব স্বয়ংসম্পুর্ণতা, তার মধ্যে এই ধরনের রেসও হতে পারে। কিন্তু বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করছিল। মেলার পরে সেখানে একটা গানের আসর বসল, এবং সেই গান হচ্ছে কীর্তন গান। খৃষ্টিয় কীর্তন, কিন্তু গান শুনতে গিয়ে দেখলাম সেটা বিশুদ্ধ কীর্তন এবং তার তালটালগুলো একেবারে বিশুদ্ধ কীর্তনের তাল, অর্থাৎ দশকুশী তাল। তালটা বেশ কঠিন। তখন সেই কীর্তনের উৎসে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে জিগেস করলাম, এই কীর্তন কোথা থেকে এলো ? তখন জানা গেল আজ থেকে একশো বছর আগে মতিলালা পাদরী বলে একজন ব্যক্তি ছিলেন--- মতিলাল মণ্ডল -- তিনি এই কীর্তনের দল তৈরি করেছিলেন। তাদের সঙ্গে যারা গান গাইতেন, তার মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল, তার নাম কালু মিস্ত্রি। সে ছুতোর। বলল, আমার বয়স এখন তিরাশি। আমি মতিলাল পাদরীর দলের কীর্তন গান গাইতাম। তখন দেখা গেল, বাংলাদেশের প্রচুর জায়গায়। এখন যে জায়গাগুলো বাংলাদেশের অংশ, সেসব জায়গায় প্রচুর প্রোটেস্টান্ট চার্চ। সেইসব জায়গায় এইসব কীর্তনের প্রতিযোগিতা হত। আজও হয়, তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। তা, আমি একবার খোঁজ করতে করতে মতিলাল পাদরীর নাতির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন যে, আমার দাদামশাই কীর্তন শিখেছিলেন নবদ্বীপে গিয়ে। বিশুদ্ধ ভারতীয় কীর্তন শিখে এসে খৃষ্টিয় সমাজে সেই কীর্তনের প্রবর্তন করেছেন। আর আমাদের কীর্তন যখন প্রায় উঠেই গেছে, তখন দেখলাম বিশুদ্ধ কীর্তন একটি খৃষ্টীয় সমাজে বেঁচে আছে !

এর থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের অন্বেষণের দিকটা বোধ হয় একটু ঘুরিয়ে দেওয়ায় সময় হয়েছে। শহর প্রান্তিক অংশ থেকে সরিয়ে

আরেকবার তলা থেকে, হিষ্ট্রী ফ্রম বিলো যাকে বলে, একেবারে তলা দিক থেকে জীবনকে আরেকবার দেখতে শু করি যদি, তাহলে এমন আশর্চ্য রকমের বিপ্লব হয়ে যাবে আমাদের মনের মধ্যে, এমন আশর্চ্য রকমের তথ্য আমাদের কাছে এসে যাবে। যে আমাদের হয়তো ভেবে দেখতে হবে যে, ---আমাদের জীবনযাপনের যে নিজস্ব ছন্দ, সেটা ঠিক না এটা ঠিক ?

এই দিশা দেখতে গিয়ে আমরা যেটা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে আজ থেকে দুশো বছর আগে, ১৭৭৪ সালে বাংলাদেশে জন্মেছিলেন ল ালন ফকির। ১৭৭৪ সালে রামমোহনেরও জন্ম হয়েছিল। যেসময়ে রামমোহন জন্মেছিলেন এবং আমাদের যে রেনেসাঁসের কথা বলা হয় --- সেই নবজাগরণের যারা প্রবক্তা ছিলেন, তাদের কথা আমরা ক্লাসে পড়ি, তাদের জীবনী পড়ি, অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু আমরা ভাবি না যে, যে সময়ে রামমোহন এইসব কথা ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে গ্রামের মধ্যে আরো কেউ কেউ ভাবছেন। এই কথাটা যে আমরা ভাবিনা, সেটা আমাদের একটা শিক্ষার দৈন্যই। যেভাবে আমাদের শিক্ষার সিলেবাস তৈরি হয়েছে, তাতে নানা কারণে অ মরা এই লোকগুলোকে কখনও গ্রহণযোগ্য মনে করিনা। সেটা ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তি মোচনের সময়ে এসে গেছে বলে মনে হয়। আমরা লক্ষ করি, আমরা যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ি -- আমাদের মাষ্টার মশাইদেরই লেখা --- পড়তেপড়তে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে আমরা ঠেকে যাই। সেখানে রামেরের শিবায়ন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কবিগান, এলো -- এলো না -- এরকম অবস্থা। এরকম সময়ে হঠাৎ আমরা এককথায় বলে দিই যে এটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ডেকাডেন্স। একটা অবক্ষয়ের সময়, এই সময়ে বাংলা সা হিত্যে কিছু রচনা হয়নি। এইবার যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের পুঁথির জগৎ থেকে সরে অন্যদিকে তাকাই, গ্রামের দিকে তাকাই, ত াহলে কিন্তু এই ডেকাডেন্সটা আর দেখতে পাবো না। আমরা দেখতে পাবো কুষ্টিয়া কুমারখালি যশোর ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম পাবনা ঘুরতে ঘুরতে -- না, ডেকাডেন্স না, প্রচণ্ড জ্যোতির উৎসব। নতুন ধবনের রেনেশাঁস হয়েছে সেখানে। সেখানে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যসূত্র তৈরি হয়েছে। এমন অনেক গান লেখা হয়েছে, যে অ-গান অন্তত আমরা লিখতে পারিনি -- সভ্যমানুষ, লালন ফকির সেইসব গান লিখেছেন, পাগ্‌লা কানাই সেইসব গান লিখেছেন। আরো পরে হাসন রাজা সেইসব গান লিখেছেন। এবং এমন আশর্চ্য আশর্চ্য গ ান আমার পেয়ে যাই সেই সুবাদে --- যে, দেখতে পাই আমরা যেখানে সমাধানগুলো করতে পারিনি, জ্ঞানমার্গের পথে চলতে চলতে ক্রমশই নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছি, ওরা সেখানে সফল হয়েছে। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা আমরা যখন আলোচনা করি, ইতিহাস যখন পড়ি, তখন একটা করে আলোকস্তম্ভের কথা -- রামমোহনের কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, দেবেন্দ্রনাথের কথা বলি, কিন্তু মানুষের স ামূহিক জাগরণের কথা বড়োএকটা বলা হয়না। কিন্তু আমি যদি এইবার গ্রামের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, যে ঐরকম আলে াকস্তম্ভের মতো ব্যক্তিত্ব হয়তো নয়, কিন্তু একেকটা লোকের জীবনী পড়ছি আর দেখছি তাহার কুড়ি হাজার শিষ্য ছিল --- তাহার চল্লিশ হাজার শিষ্য ছিল -- এরকম একটা করে উক্তি পাওয়া যাচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা গিয়েই এরকম উক্তিগুলি করেছেন

যেমন ধরা যাক, মেহেরপুরের বলরাম হাড়ি। তার জীবন যা পাওয়া যায়, তাতে এইরকম বিবরণ আছে যে, মেহেরপুরে মল্লিকবাড়ি ছিল। সেই মল্লিকবাড়ির বলরাম হাড়ি দারোয়ান হিসেবে কাজ করতেন। খুব ভালো তীরন্দাজ ছিলেন। ডাকাত-টাকাত এলে তাদের দূর থেকে তীর মেরেই উনি ভাগিয়ে দিতেন। সেই বলরাম হাড়ি যখন বাড়িয়ে দারোয়ানের কাজ করতেন, জাতে হাড়ি --- নিম্নবর্গ --- একবার মল্লিকদের বাড়ির যে কৃষ্ণমূর্তি, তার সর্বাঙ্গে অলঙ্কার ছিল সোনার ---সেই সোনার অলঙ্কার চুরি হয়ে গেল। তখন সবাই স্বভ াবতই বললো, ঐ বলরামই চুরি করেছে। কোনো বিচার বিবেচনা না করে বলরামকে একটা গাছে বেঁধে প্রহার করা হল। প্রচণ্ড প্রহার করার পর বলরাম গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেল। এইখানে অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে এই বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, তাহার পর দীর্ঘকাল বলরামের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সুদীর্ঘকাল পরে তিনি আবার মেহেরপুর গ্রামে ফিরিয়ে আসিলেন। তখন তার মুখে দাড়ি চুলে জটা. তিনি এসে একটা নতুন সম্প্রদায় তৈরি করলেন। সেই সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে বলরাম হা ড়ি সম্প্রদায়। বলরামের চেলা। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কতকগুলো নিয়ম। এক নম্বর নিয়ম হচ্ছে, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করবে না। দুই হচ্ছে, গঙ্গাজলকে মানবে না। তিন হচ্ছে, কোনো উচচবর্ণের মানুষকে দলে নেবে না। সেখানে গিয়ে যখন আমি বললাম যে, তোমাদের এই বলরামচন্দ্রকে তোমরা কি খাওয়াচ্ছো ? আমাদের কিছু প্রসাদ দাও। আমায় খানিকটা আখের গুড় একঘটি জল দিল। বললো, বলর ামচন্দ্রের প্রসাদ হচ্ছে গুড় আর জল। এই যে লোকায়ত মানুষ একজন, এই লোকটি ছিলেন বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলে একজন ব্যক্তি - হিন্দু কাস্ট্স এ্যাণ্ড সেক্ট্স্ বলে যাঁর বিখ্যাত বই আছে - তিনি বলরাম হাড়ির সন্ধানে মেহেপুরে গিয়েছিলেন। তখন বলরাম মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার একটা এ্যাকাউন্ট যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশাই লিখেছেন -- বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ -- লিখেছেন যে, আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন তাঁর বিধবার সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, অ ামি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম। যখন তাঁরা বললেন, আমাদেরবাড়িতে খান, আমি বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদের বা ড়ি খাবো না। তাই শুনে তিনি আমার সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা বললেন না। কিন্তু লক্ষ করে দেখলাম যে, ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে প্রচুর খেদ এবং ক্ষোভ আছে। আসলে এই ক্ষোভ আর খেদটা হচ্ছে, উচচবর্ণের বিদ্ধে। বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ একটা গানে লিখেছিলেন--- বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধ্যাবেলা, কোন বলরামের আমি চেলা। এই বলরামের চেলারা উনিশ শতকের কুষ্টিয়া থেকে আরম্ভ করে, মেহেরপুর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত গ্রামবাংলা মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর চল্লিশ হাজার শিষ্য ছিল। আমি, দেশভাগ হবার পর, -

-- যখন বাংলাদেশ হল একাত্তর সালে --- তখন মেহেরপুরে গিয়ে এই বলরামের চেলাদের দেখে এসেছি। মেহেরপুরে তাদের এখনও কত প্রতাপ। সেই মানুষগুলি সরাসরি এমনকি কৃষ্ণনগরে আমার বাড়িতেও চলে এসেছেন --- বলরামের চেলারা। এবং তাদের মধ্যে একটা আশর্চ্য রকম শক্তি আছে, মনের শক্তি আছে, এটা আমি লক্ষ করেছিলাম। একেকটা প্রতিবাদী মানুষ তৈরি হয়েছে একটা করে চেতনার মধ্যে থেকে।

চৈতন্যের জন্ম কিন্তু একটা বড়ো নির্ণায়ক ঘটনা আমাদের সমাজে তিনি যেটা করেছিলেন, সেটা শাস্ত্রের সরলীকরণ। দুভাবে বলতে গেলে, শাস্ত্রের সরতলীকরণ, মন্ত্রের ঈশ্বরকে পাবার জন্য যে-পথ, সে পথকে অনেক সহজ করে দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। সেটা করতে গিয়ে তিনি জ্ঞাতিধর্মের ভেদরেখাটি ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনিহরের্ণামৈব কেবলম্ এই কথাটি বলে হরিনামের মধ্যে দিয়েই মুক্তি --- এই কথাটি এত সুন্দর করে বলতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কাজটা আমাদের দেশে অন্যতর ধরনের কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। চৈতন্যের এই প্রতিবাদ শাস্ত্রের বিদ্ধে এবং বদ্ধ ধর্মের বিদ্ধে। ধর্মের মধ্যে যে বহতা স্রোত তিনি আনতে চেয়েছেন, তাতে এই লাভ হয়েছে যে, আমাদের দেশে অনেকগুলো গৌণ সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে। ইংরেজরা মাইনর রেলিজিয়াস সেক্ট বলে। এই গৌণ সম্প্রদায়ীরা বৈষ্ণবদেরই ছোট ছোট ভাগ এবং উপবিভাগ। শুধু চৈতন্যের প্রভাবেই যে সব হয়েচে তা নয়, তার সঙ্গে সুফীদের একটা প্রচারণা ছিল, শেষ - বৌদ্ধদেরও কিছু কিছু ব্যাপার ছিল এর সঙ্গে মিশে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আর মোল্লাতন্ত্রের বিদ্ধে একটা ক্ষুদ্ধ প্রতিবাদী চেতনাও মানুষের মধ্যে ছিল। এই সবগুলো মিলে মিশে -- খুব সুনির্দিষ্টভাবে রসায়নটা আমরা বলতে পারবো না--- আমাদের মধ্যে একটা প্রতিবাদের ধরন তৈরি হয়েছিল, যার থেকে যে- প্রতিবাদী ধর্মগুলো তৈরি হয়েছিলো, সেগুলিকে ভুলভাবে, সাধারণীকৃত করে, আমরা বাউল নাম দিয়েছি।

বাউল এখন একটা জেনেরিক টার্ম হয়ে গেছে। কিন্তু বাউল কক্ষণো জেনেরিক টার্ম নয়। বাউল হচ্ছে একটা বিশেষ মত, বিশেষ পন্থা, এই পন্থায় যারা বিশ্বাসী, তারাই বাউল। যারা বাউল গান গায়, তারা কিন্তু বাউল নয়। আবরীতে বা মানে হচ্ছে আত্ম আর উল মানে সন্ধাণী। বাউল কথার মানে তাহলে দাঁড়ায়, যে আত্মসন্ধানী। আরেকটা মানে বাতুল বা যারা ওয়ার্ল্ডলি, মানে জাগতিকভাবে, স্বাভাবিক নয়। তাদের বাতুল বলা যেতে পারে। আবার বায়ু শব্দের সঙ্গে ল যোগ করে, যারা একটু বিকার গ্রস্ত, এইভাবেও বাউলের সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। এগুলো সবই কিন্তুপণ্ডিতী চেষ্টা। প্রকৃত বাউলদের কাছে জিগেস করলে তারা খুব হাসে। আমরা যখন এবার সম্প্রতি বিশ্বভারতী গিয়েছিলাম --- পৌষমেলায়, অবশ্য আর পাঁচজন যেভাবে যায় সেভাবে যাইনি, আমি গিয়েছিলাম বাউলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, আমার একটু কাজ ছিল -- গিয়ে, প্রথম যেটা দেখলাম যে, রবীন্দ্রনাথ -- যিনি বাউলদের বলতে গেলে আবিষ্কারই করেছেন, এবং তাঁর মতো এতোবড়ো বাউলপ্রেমী আমাদের দেশে প্রায় কেউই সেসময়ে ছিলেন না, উচচবর্গের কোনো লোকই যখন নিম্নবর্গের এই গানের স্রোতটিকে জানতেন না, তখন তিনি জেনেছিলেন -- গিয়ে দেখলাম, সেই রবীন্দ্রনাথের হর্ম্যময় শান্তিনিকেতন, অতবড় বড় বাড়ি প্রাসাদ, কিন্তু বাউলগুলি রয়েছেন মঞ্চের পাশেএকটা চটের মধ্যে মাটিতে বসে, প্রচণ্ড শীতের হাওয়ায়। বাউল ফকিরদেরে অমনিই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদেরঅনেককেই ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি। তার মধ্যে একজন, এনায়েত ফকির, বসেছিলেন -- পরাণপুরে তাঁর কিছু- না - হোক একশো বিঘে জমি আছে। তার কাছে গিয়ে যখন বললাম -- একি, আপনি মাটিতে এরকম বসে আছেনখড়ের ওপর ? ---বললেন, আমি তো ফকির। বললাম, আপনি ফকির কিনা জানিনা, তবে এখানে আপনাকে ফকির বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের উচচবর্গের দৈন্য যে - পর্যায়ে চলে গেছে, আমরা ভেবেছি বোধহয় যে বাউলফকিরদের শান্তিনিকেতন পৌষমঞ্চে একবার গাইতে দিলে বোধহয় তারা কৃতার্থ হয়ে যাবে। তারা কিন্তু তার জন্যে আসেনি। তারা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতেই সেখানে এসেছে, বলেছে তারা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে যে, মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লেখা রয়েছে, পৌষমেলা বিনোদন মঞ্চ। তার তলায় লেখা আছে ফিলিপ্স্ আপনারচিরজীবনের সাথী। ---এইটা যদি আমাদের পৌষমেলার এ্যাটিচ্যুড হয়, এই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যদি এই জিনিস চলতে থাকে, যেখানে কোনো বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ নেই, সেখানে আমাদের ফিরে ভাবতেই হবে যে আমাদের এই বাউলদের নিয়ে রসিকতা করার কোনো অধিকার আছে কিনা, তাদের মাটিতে বসিয়ে দেবার কোনো অধিকার আছে কিনা, এটাও আমাদের জানবার আছে। যেখানে শান্তিনিকেতনে অজস্র গেস্ট হাউস, অজস্র থাকার জায়গা, বড়ো বড়ো ক্লাসম, সেখানে তাদের রাত্রের আশ্রয়টুকু জোটেনি ভাবতে খুব লজ্জা লাগছিল আমার। আমি তাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটালাম সব্যথী হিসেবে। এই মানুষগুলো কিন্তু এসেছিল একেবারে প্রাণের টানে। কেননা আমি তাদের জিগেস করলাম, আপনারা কত পাবেন। তার উত্তরে বললেন, গতবছর শুধু গাড়িভাড়া পেয়েছিলাম পঞ্চাশ- ষাট টাকা। কেউ কেউ দেখলাম প্রায় দেড়শো-দুশো মাইল থেকেও এসেছেন, পঞ্চাশ - ষাট টাকায় তার গাড়িভাড়া হয়না। প্রাণের টানেই তারা এসেছেন। তারা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন যে, আমরাই ফকির। তাঁরাই সমৃদ্ধ, মনেরদিক থেকে। এই আত্মসন্ধানী মানুষগুলোকে আমরা বাউল বলে ভুল করেছি। এর জন্যে আমাদের --- আবার বলছিযে -- আমাদের লেখাপড়া জানা মানুষদেরই কিছু দোষ দুর্বলতা রয়ে গেছে।

যেমন ধরা যাক, বিহারীলাল চক্রবর্তী বাউল শতক গান আছে এবং তখনকার দিনের সব পুরনো গানটানের বই খুললেই দেখবেন লক্ষ করে, লেখা আছে বাউল সুরে গেয়। বাউলসুরটী কী ? এইটা যারা আমরা সাংগীতিকদিক থেকে ভাবি একটু, আমাদের বিরাট খট্কা

জাগে এবং প্রথম তোলেন আমাদের মধ্যে খালেদ চৌধুরী। তিনি প্রথম আমাকে একদিন জিগেস করেন, আচ্ছা বাউল সুর কী বলুন তো। তখন এই খট্‌কার জন্ম আমার মধ্যে। আমি অনুসন্ধান করতে শু করলাম। দেখলাম, বাউল সুর বলে কিছু নেই। যা আছে তা হচ্ছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গ যাকে বলে, বাংলার যে পশ্চিম অংশ, পুলিয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর এইদিক যে বাউলিগুলো গাওয়া হয়, তার বেস্ - টা হচ্ছে ঝুমুর। এইবার নদীয়া যশোর মুর্শিদাবাদ মালদা ঘিরে যে বাউলগান গাওয়া হয়, সেগুলো সবই হচ্ছে ভাওয়াইয়া বেস্‌ড্। আর পূর্ববঙ্গে যাকে বাউল্যা গান বলে, প্রচুর ভাটিয়ালির ব্যাপার আছে। তবে, স্ট্যাণ্ডার্ড বাউল, বাউলসুরে গেয়ে কথার মানেটা কী ? এই কথা এল কোথা থেকে ? আমাদের পণ্ডিতরা ওপরে বাউল সুরে গেয়ে এই কথা লিখে দিয়েছেন, এর রহস্যটা কী ? এর রহস্য ভেদ কর ার জন্যে আমাদের একটু রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাতে হলো।সেটা আপনাদের কাছে একটু বিস্তারিত করে বলি। একটা গান গেয়ে দেখ াই, তা না হলে তো সুবিধা হবে না। কারণ গানের আলোচনাটা অনেকটা মিষ্টির আলোচনার মতো। অমুক জায়গায় খুব ভালো মিষ্টি পাওয়া যায়, বড়ো বড়ো সাইজ। এ না বলে খাওয়ালে সুবিধা হয়। তা আমি যেহেতু একটু আধটু গান করার দুঃসাহস রাখি, সবিনয়ে আপনাদের কাছে একটু গান শোনাই। ছাত্ররা ক্ষমা করে দেবে। কারণ আমি ঠিক প্রথাবদ্ধ ভাবে তো গায়ক নই। গানেরঅনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে একটু জানতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চুঁচুড়াতে নৌকোর ওপর থাকতে ভালোবাসতেন। চুঁচুড়া চন্দ্রনগরে হাউসবোটে থাকতেন। তা হ াউস বোটে তখনকার দিনে আরো যারা থাকতো, তারা হচ্ছে মাঝিমাল্লা-- বেশির ভাগইনদীয়া পূর্ববঙ্গ পাবনা থেকে আসতো। পাবন াতে তো রবীন্দ্রনাথের জমিদারিই ছিল সাজাদপুরে । সাজাদপুর পতিসর শিলাইদহ কালিগঙ্গা চারটে জায়গায় জমিদারি ছিল। এখ ানকার সব কর্মচারীদের উনি নিয়ে আসতেন, নৌকোয় তার মাঝিমাল্লার কাজ করতো। তা ঐখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনী সরলা দেবী চৌধুরানী -- যিনি খুব বড়ো সংগীতকার ছিলেন, তিনি -- মাঝিমাল্লাদের গানগুলো শুনতেন। বলা বাহুল্য তারা দেবেন্দ্রনাথকে গ ান শোনাতো না, দেবেন্দ্রনাথ তো ভেতরে থাকতেন, ওরা বাইরে গানটান করতো। সরলা দেবী আপনমনে গানগুলো শুনে টুকে নিতেন, নিয়ে স্বরলিপি তৈরি করতেন। এবং সেইটাই পরে তিনি শতগান নাম দিয়ে বার করেছিলেন। সবই ঐ মাঝিমাল্লাদের গান। সরলা দেবী তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন, যে এইভাবে যখনই কোনো নতুন গান শুনতাম, সঙ্গে সঙ্গে রবিমামাকে গিয়ে শোনাতাম। এখানে রবিমামা ব্যক্তিটি হচ্ছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ওঁর কাছে রবিমামা। সেই রবিমামার কাছে গানগুলি না শোনানো পর্যন্ত মনে শান্তি হতো ন া। রমিমামা ব্যক্তিটি এমনই আশর্চ্য ব্যক্তি যে গানগুলো কিন্তু চুপচাপ উনি উনিশ শতকের শেষে শুনছেন, প্রাণের ভেতর তার সুরটা ঢুকে যাচ্ছে, গানগুলোর নির্মাণ কিন্তু তখন হয়নি। অনেক পরে ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হল, তখন সেই গানগুলো রচনা করে তাতে কী সুর দেবেন এই কথা যখন তাঁর মাথায় এলো, তখন ঐ ভাগ্নী সরলা দেবীর গানের সুর তাঁর মনে পড়ে গেল। এবং লক্ষ করে দেখা যায়, রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় -- যে স্বদেশী গানগুলো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তার পাণ্ডুলিপিটা আছে --- সেই প াণ্ডুলিপির ওপরে সুরগুলো লেখা আছে, অমুক গানের সুর, তমুক গানের সুর লেখা আছে। সেই গানের সুর আবার যেহেতু সরলা দেবীর শতগানের মধ্যে স্বরলিপি আকারের আছে, কাজেই আমাদের দেখার পক্ষে খুব সুবিধে হয় । সরলা দেবী যে - গানগুলো সংগ্রহ করেছিলেন, যেমন, তার থেকে একটা নমুনা শুনিয়েদেখাচ্ছি,

সবাই গেছে সংকীর্তনে
আমার গৌর অঙ্গে ধূলি ক্যানে
ওরে কী কথা তার পড়লো মনে, যার গড়াগড়ি
গৌর কেন ফিরে এলো, ও সহচরি।।
ওরে তোর বা কী ভাব তার বা কী ভাব বুঝিতে নারি।
গৌর কেন ফিরে এলো, ও সহচরি।।

এই যে গানটা শুনলেন, এটা বাউলগান নয়। কিন্তু এই গানটা হচ্ছে কীর্তনভাঙা ঢপকীর্তন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের---

মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ।।
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাব না ---
ওই - যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি ।।

এই - যে গান, একেবারে নিজেকে দিয়ে গানটা গাওয়া যায়। গানের পুরো ছকটাকে ভেঙে দিয়ে আপনমনে এই - যে গানটাকে নতুন করে নির্মাণ করা যায়, এটা হচ্ছে কথকতা আর ঢপকীর্তনের মাঝামাঝি একটা ফর্ম। অনেক জ্যেষ্ঠঅবস্থায় কৃষ্ণকলি আমি তালেই বলি গানটা কলেছিলেন তখন এই ছকটা গানের নিয়েছিলেন। আমি যে গানটা আপনাদের শোনালাম---

গৌর কেন ফিরে এলো
সবাই গেছে সংকীর্তনে
আমার গৌর অঙ্গে ধূলি ক্যানে

এই আর্তিটাতে উনি রূপ দিলেন

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
তুমি যে সকল - সহা সকল - বসা মাতার মাতা ।।
ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
একে আমাদের গানের ভাষায় ট্রান্সফর্মেশন বলে, গানের ট্রান্সফর্মেশন। মানে মাত্রা পাল্টে গেছে তাই নয়, আমি বলব, একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে গানটা। আমরা ভাবতেই পারি না। গানটাকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস রবীন্দ্রনাথকে কেন বলা হয়, তার একটা খুব সরল প্রমাণ তো এইখানেই পেলাম। কিম্বা ধরা যাক আরেকটা যে-গান, সেটাও কিন্তু বাউল নয়, সেটাও ঢপকীর্তনেরই গান---
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই।
একলা নিতাই --- একলা নিতাই --- একলা নিতাই।
এই গানটা সরলা দেবীর সংকলন থেকে রবীন্দ্রনাথের কানে ছিল। তার থেকে,
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো,
লক্ষ কন যে, একলা কথাটা কিন্তু তিনরকম সুরে প্রলম্বিত করা হয়েছে। একক ক্ষেত্রে তিনটে মাত্রা আছে গানে
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই
একলা নিতাই -- একলা নিতাই --- একলা নিতাই
কিন্তু এখানে একই আছে, একই স্বরগ্রাম আছে। কিন্তু যদি তোর ডাক শুনে - টা গাইতে গেলে---
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো একলা চলো রে।।
এই - যে নির্মাণ, ভেতরকার সূক্ষ্ম নির্মাণ রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, একলা নিতাই থেকে একলা চলো - তে চলে যাওয়ার যে ক্ষমতা, সে তো সুরের নয়, থিমেরও। বাউলের একলা চলা আর বিপ্লবীর একলা চলাকে প্রায় অদ্ভুতভাবে রবীন্দ্রনাথ গেঁথে দিয়েছেন অন্য জায়গায়। প্রসঙ্গত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যে উজান গাঙ্গ বাইয়া আত্মজীবনী আছে, তাতে আছে, যে এই গানটা উনি খুব গাইতে ভালোবাসতেন। এবং তখনকার অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলনে গাইলে কম্যুনিস্ট বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলতেন যে কম্যুনিস্টের পথ একলা পথ নয়, সকলের পথ। এ গান তুমি গাইবে না। হেমাঙ্গবাবুর বলেছেন, আমার মনে মহাসংকট তৈরি হল যে, এ গানটা গাইতে ভালো লাগে অথচ গাইতে পাই না, কী আর করি ? তারপর পরিণত বয়সে চীনে গেলেন। সেখানে এই গানটা গাইবার আগে এই গানের একটা চীনে অনুবাদ তৈরি করিয়ে, চীনের যারা সাংস্কৃতিক নেতা, তাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন, যে, দেখুন এই গানটা কেমন হবে, গানটা গাইলে ? শুনে -- হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখছেন যে -- তারা বললো, এইটাই কম্যুনিস্টের গান। যখন কেউ আসবে না তখন একলা যেতে হবে। কে লিখেছে বলো তো ? খুব বড়ো কম্যুনিস্ট বলে মনে হয়। তখন জানানো গেল, সেই কম্যুনিস্টের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ! এখন, গানের ট্রান্সফর্মেশনের মধ্যে দিয়ে, গানের পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে, লোকায়ত গান কোথায় চলে যায়, ধর্মীয় গান কিভাবে ব্যক্তিক হয়ে যায় এবং ধর্মীয় আকৃতি কীরকম করে একটা জাতীয়তার আকৃতিতে পরিণত হয়, রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের গানগুলো সব একটা একটা করে বিশ্লেষণ করলে নিশ্চয়ই আমরা খুঁজে পাবো। কিন্তু তার স্থান তো আজকে নয়।
আজকে যেটা বলবার সেটা এই যে, আমাদের গৌণ ধর্মগুলো যখন গড়ে উঠেছিল, তার একটা সংগীতের ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা বলেছেন যে, শাস্ত্র দিয়ে যখন আমরা ধর্মকে দেখি, পূজা ব্যবসায়ীরা যখন মন্দির গড়ে, তখন মন্ত্র রচনা হয়। আর যখন শাস্ত্র ভেঙে যায়, মন্দির ভেঙে যায়, দেবতা নেমে আসেন পথে, তখন জেগে ওঠে গান। ঐজন্য আমাদের লোকায়ত ধর্মগুলো গান দিয়ে নিজেকে বলেছে। তারা মন্ত্র দিয়ে প্রায় কিছুই বলেনি। তাদের প্রায় কোনো আপ্তবাণীই নেই। তাদের যা কিছু বলবার, সব তারা গান দিয়েই বলে। সেজন্য গানের ভিতর দিয়ে লোকায়ত ধর্মকে সন্ধান করাই সবচেয়ে সহজ কঠিন ও বটে। কারণ গান সম্পর্কে সবচেয়ে গোলমাল হল, যে গান স্বভাবতই বিনোদনের জিনিস। গান শুনতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ে গানের ভেতরটা হারিয়ে ফেলি, গানের সুরেই মোহিত হয়ে যাই। কিন্তু যাঁরা লোকায়ত গান লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের ভেতরকার থিমটাকে হারিয়ে যাওয়ার জন্য লেখেন নি।

জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা
ওরে সত্যকথায় কেউ রাজি নয়,
সবই দেখি তা না না না।
তা না না না শব্দটা দেখবার মতো, এড়িয়ে যাবার ভাষায় আর - কি !
জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা
ওরে সত্য কথায় কেউ রাজি নয়,
সবাই দেখি তা না না না
যখন তুমি ভবে এলে, তখন তুমি কী জাত ছিলে,
যখন তুমি যাবে চলে,
তখন তোমার কী জাত হবে।।

এই গানে যিনি তুলোছিলেন প্রশ্ন, তাঁরই তো নাম লালন ফকির। জাতিতত্ত্বের সংকট, তাঁকেই তো বারবারসব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ? তাঁর গান থেকে বুঝতে পারি, তাঁর জীবনযাপনের মধ্যে এমন কিছু রহস্যছিল, যার জন্য সকল লোক জানতেই চেয়েছিলেন যে, আপনি কী জাত ? হিন্দু না মুসলমান -- পরিষ্কার কথা ?

হিন্দু না ওরা মুসলিম --- এই প্রশ্ন শুধু নজলের নয়, একদম লালন থেকেই শু তার। তার একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাসও বোধহয় আছে। হিন্দু না মুসলিম --- এই প্রশ্নে উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত যেন আমাদের ঠিক সমস্যার সমাধান হয় না। যদি বলা যেত, হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, সমাধানটা সেখানেই হয়ে যেত। কিন্তু আজ পর্যন্ত, মণিরত্নমের বোম্বে সিনেমা পর্যন্ত এলেও কিন্তু সংকটের সমাধান হয় না। সেখানে দেখা যায় যে, মেয়েটি একটি ছেলেকে ভালোবেসে চলে যায়, নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যা ভালোবাসার টানে, কিন্তু সঙ্গে তার ধর্মীয় গ্রন্থ এবং নামাজপড়ার জন্য জায়নামাজের পাটিটাও সঙ্গে নিয়ে যায়। কী আশ্চর্য ! এবং সেই জায়নামাজের পাটিটাও আরো সুরক্ষিত থাকে। তার কোরাণটিও সুরক্ষিত, তার জীবনটিও সুরক্ষিত থাকে ! কিন্তু মণিরত্নমের ছবিটা নাকি আমাদের অসাম্প্রদায়িকতার ছবি ! আমি মেনে নিতে পারি নি। কারণ যার যার নিজের নিজের ধর্ম বজায় রাখার মধ্যে আর যাই থাক, অসাম্প্রদায়িকতা নেই। যার যার নিজের সাম্প্রদিায়িকতাকে ভেঙে দেওয়ার মধ্যেই অসাম্প্রদায়িকতা আছে। মণিরত্নমের ছবি অতএব একদিক থেকে সমাধানহীনের পৃথিবী। একথা বলেছি এইজন্যে যে, এই অসাম্প্রদায়িকতার সংকট আসলে আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শু হয়েছে, লালন ফকির লোকটি কী ছিলেন, হিন্দু না মুসলমান, এই নিয়ে একটা বিশাল বই লেখা যায়। তাতে দেখা যায় যে, একদল বলছে তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত হয়ে ফকির হয়েছিলেন। আরেকদল বলে, না, তিনি মুসলমানই ছিলেন। কিন্তু মুসলিম ছেড়ে ফকির হয়েছিলেন।

এই জায়গাটা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে চাই। একজন কেন ফকির হয় ? যারা ফকির হয়, যারা ফকিরীতন্ত্রের মধ্যে আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে একমাত্র সেটা বোঝাযায়, কেন সে ফকির হয়েছে। একটা লোক, ধরা যাক তার নাম, জলিল, সে জমিতে চাষ করে, সে কিন্তু ফকির হয়ে গেছে। তাকে যখন জিগেস করলাম যে, আচ্ছা জলিল, তুমি ফকির হলে কেন ? লক্ষ করে দেখুন যে, ধর্মের দিক থেকে সে খুব অসহায় ব্যক্তি। তাকে মসজিদ মানতে হয়, মৌলানা মানতে হয়, সে গরীব মানুষ --- শহরের গ্রামের সমস্ত মুসলমান কর্তাব্যক্তিদের মানতে হয়, তবুও সে ফকির। তার নিজের জোরে সে ফকির। যখন জিগেস করলাম, উত্তরে সে বলল যে, দেখুন নামাজ পড়তে যখন যাই, মসজিদে গেলে পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে বলে যে ঐদিকে আল্লা আছে। বলেই, জলিল আমাকে বলল যে, এরকম আন্দাজী কথায় আমার ঠিক ভরসা হল না। এই কথা কিন্তু আমরা বলতে পারব না। এইভাবে বলার জন্য পায়ের তলায় একটা অনন্য মাটি লাগে। ---ঠিক আন্দাজী কথায় বুবু আমার পেট - ভরলো না, তাই আমি ভাবলাম, আচ্ছা এইপথটা করে দেখি। তা এই পথে আমি একটা পথ পেয়েছি, জানে। সেজন্যে আমি আর এখন নামাজ পড়িনা। যারা ফকিরীতন্ত্রের মধ্যে আছেন, ফকিরগু যারা, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। একটু সরল করে বলার চেষ্টা করি। মুসলমানদের পাঁচটি বিশ্বাসের জায়গা, আগেই বলেছি। প্রথমটা হচ্ছে, কলমা -- লা ইলাহা ইল্লালাহা মহম্মদ বসুল্লাহা --- ঐটা বিশ্বাস করে, তার মানে একজনকেই সে উপাস্য বলে মনে করছে, আল্লাকে, আর কাউকে নয়। দুই হল, নামাজ। তিন হল, রোজ ---অর্থাৎ বছরে একবার রমজানমাসে পুরো একমাস দিনের বেলা কিছু না খাওয়া, শুধু রাতে খাওয়া। তারপর হচ্ছে জাকাত ---প্রতি শুক্রবারে নামাজের পর গরীব মানুষকে কিছু দেওয়া। আরেকটা হচ্ছে, যারা অর্থবান তাদের কাছে, হজ। হজ যিনি করে আসেন, তিনি হাজী। পাঁচটি কৃত্য যিনি করতে পেরেছেন ---আকাইদা বা বিশ্বাস ---একদম খাঁটি মুসলমান বলা যায় তাকে। এইবার যদি আলাদা খোঁজ নেওয়া যায়,খাঁটি মুসলমান সবাই নন এই অর্থে যে পাঁচটি আকাইদা সবার জীবনে হয়নি। তখন সরল সমাধান করে বলা হয়, তুমি কলমাটা নাও আর তুমি একদিন --- অন্তত, বছরে একবার নামাজ পড়ো। এই পর্যন্ত সরলীকরণ সেখানে রয়েছে। এইবার দেখুন, ঠিক চার্বাকপন্থীদের মতো আমাদের ফকিরী পন্থা অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করেছে। ওরা বলছে যে, মনের মধ্যে রয়ে গেল ভোজনস্পৃহা, তাহলে রোজা করে লাভ কী ? বলেই বলছে, বাদুড়রা তাহলে সবচেয়ে ভালো রোজা করে। সারাদিন তারা

কিছু খায় না, রাতে খায়। তারপর বলছে যে, মন রয়ে গেল অপবিত্র, নামাজ পড়ে কী করবো? এরকম ক রে দেখা যায়, যে, প্রত্যেকটা বিষয়ে তারা যে প্রতিবাদ তুলেছে, তার থেকেই তারা ফকির হয়ে গেছে। ফকির হয়ে গেছে, কথাটার মানেই হচ্ছে যে, মুসলমানদের যে মূল অর্ডার, সেই স্থিতি থেকে তারা সরে গেছে। নিজেদের অবস্থানকে সরিয়ে নিয়েছে। সরিয়ে নিয়ে তারা বলছে, আমাদের পথ শরিয়তের পথ নয়। শরিয়তের পথ মানে হচ্ছে, যে-পথ ইসলাম কর্তৃক সুনির্দিষ্ট, শাস্ত্রীয় -- সেটাই শরিয়তের পথ। শরিয়তের পথ যার া ত্যাগ করেছে, তারা নিজেদের বলে, আমরা মারফতী। মারফত কথার মানে হচ্ছে জ্ঞান। অর্থাৎ আমরা জ্ঞানী। আমরা ধর্মের সাম্প্রদ ায়িক বা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার চেয়েও, যেটা জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, ভাবের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, সেটারসম্বন্ধে বেশি উৎসাহী। এইখানে এসে তারা একটা লোককে ধরে --- গু বা বরজক্। এই গু বা বরজক্কে তারা মুরশেদের চরণ ভরসা, এই হচ্ছে ফকিরী গ ানের একটা মূল কথা। মুরশেদকে যে - মুহুর্তে সে প্রাধান্য দিল, সেই মুহূর্তে আল্লার সঙ্গে শরিকী হয়ে গেল মুর্শেদ। সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি মুসলিম বাউলের চুলের ঝুঁটি কেড়ে নেয় আর একতারা ভেঙে দেয়। আমিনিজের চোখে দেখেছি। হুল আমীন নামে একজন ফকিরের ক াছে গিয়ে দেখলাম, তার উতেএকটা পুরো শলা বিধে দিয়েছে বর্শার, তার মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে দিয়েছে। সেই প্রতিবাদী মানুষটি বসে আছে ব্যথিত চোখে। তারকিছু করার নেই। এই কথাগুলো খুব বেশি প্রচার হয়না, আরও নানারকমের গোলমাল হবে বলে। কিন্তু এ হয়েই চলেছে। আজ থেকে নয়, দুশো বছর আগে থেকে ফকিরীদলন, ফকিরীপীড়ন চলছে।

ঠিক একইভাবে বাউলদলনও চলছে কিন্তু। বাউলরাও ঠিক একই পথ নিয়েছে। তারা বলছে, শাস্ত্রের পথনয়, মন্দিরের পথ নয়, দেবত ামূর্তির পথ নয়, ব্রাহ্মণের পথ নয়, গঙ্গাজলের পথ নয়। মানুষকে পেতে হবে মানুষেরমধ্যে দিয়ে, মানুষতত্ত্ব চিনে এবং কাঠের ছবি মা টির ঢিবি এগুলোকে অস্বীকার করে। বাউলরাও বলছে। একটা জায়গায় গিয়ে বাউলরা ফকিররা এক হয়ে যায়। বিশ্বাসে আচরণে ত াদের একটু তফাৎ আছে, কিন্তু তাদের পন্থা মাঝেমাঝে একই। এবং সেজন্যে একটা কথা আমরা চট্ করে বলে দিই যে, বাউল ফকির -- - এটা একসঙ্গে বলা উচিত না।বাউলরা হচ্ছে একটা পথ আর ফকিরী হচ্ছে একটা পথ, মুসলমান না হলে ফকির হওয়া যায় না। ব াউল কিন্তুমুসলমান হতে পারে, হিন্দুও হতে পারে। হিন্দু কখনও ফকির হয় না। ফকিরদের পোশাক আর বাউলদের পোশাক আকাশপ াতাল তফাৎ। ফকিররা সাধারণ সাদারঙের একটা ধুতিকে লুঙির মতো করে পরে। তারা চে ক্ - চেক্ অলালুঙি পরে না। তারা ওপরে একটা সার্ট বা পাঞ্জাবি পরে, তলায় একটা সাদা লুঙি পরে। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরামিষাশী।

বাউলদের যে-পোশাক, সে সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী গবেষণার বিষয়ে বলা যেতে পারে যে, বাউলদের আমরা উনিশ শতকের যে ছবি দেখেছি, উপাসক সম্প্রদায়ের ছবি কিম্বা পঞ্চাশের দশকে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে আমি পূর্ণদাস বাউলের বাবা নবনীদাস বাউলকে গান গাইতে দেখেছি পঞ্চান্ন সালে, তার পোশাকের রঙ কিন্তু সব সাদাই ছিল --- সফেদ। কারণ এই ধরনের প্রতিবাদী ধর্মের রঙটাই হচ্ছে সফেদ রঙ আর গেয়া হচ্ছে বৈরাগ্যের রঙ। বাউল ধর্ম আর যাই হোক, বৈরাগ্যের ধর্ম নয়। একজন বাউলকে জিগেস করেছিল াম, যে আপনি গেয়া পরেন কেন ? সে আমাকে বললে যে, দেখুন বাড়িতে যদি শাকের একটা ক্ষেত করেন, তার চারপাশে কাটা বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগলে শাক খেয়ে চলে যায়। তা ধন, আমার এই গেয়া পোশাকটা হচ্ছে বেড়ার মতো। আমার মন যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এইটাই হাত দিয়ে বলি, আমি না একজন বাউল, আমি না একটা গেয়া পরেছি। এই গেয়া তাহলে একটা অঙ্গ বস্ত্র, সেটা তার নেট্মার্ক নয়। সেটা এল কোথা থেকে ? আমরা হঠাৎ দেখি যেওয়েস্টার্ণ এক্সপোর্ট সার্কিটে বাউলদের এখন খুব রববরা এবং বোলপুরের পৌষমেলায় কিংবা গেঁদুলির মেলাতে গেলে দেখাযাবে বেশির ভাগ বাউলের ইন্টারন্যাশনাল ফেমাস বাউল বলে পরিচয় আছে। যখন তারা বিদেশে যায়, তখন আমাদের ভারতের সংস্কৃতি দপ্তর ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাইরে প্রচার করার জন্য তাদের প াঠায়। ঐ সব সার্কিটে ঐ বাউলটা খুব --- আধুনিক ভাষায় বলা যায় --- খায় বেশি। তা এই খাওয়ার কারণটা যিনি করেছেন, তিনি ব াচচুরায় নামক এক ব্যক্তি। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, এখন ক্যালিফোর্ণিয়াতে থাকেন। তার সঙ্গে বছর দুয়েকআগে আমার অ ালাপ হয়েছিল। তিনি বললেন, একবার আমেরিকায় বাউল নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন ভাবলাম, এইশ্যাবি ড্রেস, সাদা, তাও হল্দেটে হয়ে গেছে নোংরা হয়ে, আমেরিকার ঐরকম দাণ জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চে এদেরতুললে বিচ্ছিরী দেখাবে, কী পোশাক পরানো যায় ! উনি বললেন, তখন স্বামীজীর শিকাগো লেকচারের ড্রেস মনে পড়েগেল। এবং শিকাগো লেকচারের ড্রেস মনে পড়তেই একটা গেয়া আলখা ল্লা, তার গেয়া লুঙ্গি, একখানা কোমরবন্ধ আর মাথায় একখানা পাগড়ি পরিয়ে দিলাম --- ভার্বেটিম স্বামীজী। বললেন, আশর্চ্য সেটা দ ান চলে গেছে,জানেন তো ! এখন সকলেই সেইটা পরে। আর এখন যারা বাউল, আমি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছি,তারা ব্য ান্লনের পোষাক পরে। একটা ব্যাগি পরে তার এল অটোতে, বা স্কুটারে --- লাল স্কুটারে। এসে নামলো। নেমেই ঝোলা থেকে --- তার একটা নিজস্ব টেরিকটনের বাউল পোশাক আছে --- সেইটা পরে মঞ্চে গিয়ে গানকরে চলে এল। লোকে বলল, দাণ গান শুনলাম !

পৌষমেলাতে গেয়ে মাতিয়ে দিয়ে নেমে এসেছে। এইবার আমার কাছে যেই এসেছে, আমি তাকে বললাম,কোথায় আপনার বাড়ি ? বলল, বোলপুরের প্রান্তিক ষ্টেশনের ওপারে আমার গ্রাম। আমি তখন তাকে একটা টেক্নিক্যাল প্রশ্ন করলাম, যে আপনার তো দীক্ষা হয়েছে, শিক্ষা কী হয়েছে ? এখন, এসব ধর্মে দুটো স্তর আছে। একটাহচ্ছে দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষা। তারপর শিক্ষা, মানে হচ্ছে, প্রথম ন ামশিক্ষা তারপর মন্ত্রশিক্ষা তারপর রূপশিক্ষার একটা স্তর আছে। তাকে বলে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ--- একেকটা স্টেজ অ

াছে। গু তাদের অবস্থা অনুযায়ী সেই স্টেজগুলো দিয়ে দেন। আমরা যে বি.এ., এম. এ ইত্যাদি পাশ করাই টেস্টে। সবাইকে পি-এইচ.ডি তো আমরা দিইনা। সিদ্ধের সিদ্ধ হচ্ছে পি-এইচ.ডি.। ডি.লিট খুব কমই দেওয়া হয়। এই লোকটি দেখলাম, ইলেভেন ক্লাস পাশ করতে পানে নি বাউলের হিসেবে। একদমই মাধ্যমিক পাশ। তা আমি তাকে বললাম যে, আপনি দীক্ষা তো নিয়েছেন, শিক্ষা কী হয়েছে ? সে বলল যে, শিক্ষাগু এখনও খুঁজে পাইনি। আমি এবার তাকে সবচেয়ে আশর্চ্য প্রাটি করলাম যে, আপনি তাহলে মঞ্চে উঠে গান গাইলেন কেন? কারণ বাউলগান কিন্তু এমনি গান নয় --- বিনোদনের গান নয়। গ্রামাঞ্চলে যখন ফকির বা বাউল গানের আসর বসে অনেক লোক গিয়ে নাক গলিয়ে জিগেস করে, আচ্ছা এই আসরটা কতক্ষণ চলবে বলুন তো ? প্রটা শুনে আমার অনেকটা মনে হয়, যে, ওয় ান ডে ম্যাচের ফার্স্ট ইনিংসের খেলা দেখে জিগেস করা যে, কে জিতছে? এই পর্যায়ের মূর্খতার প্রা ! কতক্ষণ চলবে বলা যায় না তার ক ারণ, বাউলগান বা ফকির গানের আসর আসলে একটা তত্ত্বের উন্মোচন। একজন একটা তত্ত্ব তৈরি করল, হয়ত প্রথম তত্ত্বের গানটা হচ্ছে এইররকম, যে জল থেকে বরফ হয়, বরফ কিন্তু জল নয়। এই দিয়ে গান শু হয়ে গেল।যেই শু হয়ে গেল, প্রত্যেকটি বাউল আসলে ভেতরে বয়ে নিয়ে চলেছে একটি নিজস্ব এ্যান্থোলজি, ফলে ঐগানটার উত্তরে এই বাউল একটা উত্তর দিল, যে একটা উত্তর দিল -- গ ানের কাটাকাটি হতে হতে একটা সময়ে একটা গান শেষ হল, তাকে বলা হয় অকাট্য গান, এর আর উত্তর দেওয়া যায় না। বেশির ভ াগ অকাট্য গানই কিন্তু লালন ফকিরের লেখা। সত্যিকারের সমৃদ্ধ বাউল ফকির হচ্ছে সে, যে খুব বেশি পরিমাণে তাত্ত্বিক গান জানে। তার মধ্যে একজনের নাম হাউরে গোঁসাই, একজন পাঞ্জু শাহ, আরেকজন হচ্ছে বুদ্ধু শাহ, আরেকজন লালন ফকির। এই চারজনের গ ান হচ্ছে অকাট্য গান। বেশির ভাগ আসরই রাত্তির হয়ত পৌনে তিনটে কি, পৌনে চারটে কি, সকাল আটটা অবধি গাড়িয়ে যায় শুধু ঐ তাত্ত্বিক গোলমালের জন্যে। প্রচুর গান শুনতে হবে, চুপচাপ বসে গান শুনে যেতে হবে। আর আমাদের পৌষমেলায় কর্তৃপক্ষ বলছেন, আমাদের সময় কম। আপনারা একটি করে গান করে চলে যাবেন। সনাতনদাস বাউল, যিনি এখনকার জ্যেষ্ঠ বাউল, আশি বছর পেরিয়েছেন, ওঁর মতো তাত্ত্বিক প্রায় কেউ নেই। সনাতনদাস বাউল মঞ্চে উঠলেন, একটা গান গেয়ে নেমে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একটা গান গাইলেনকীরকম? বললেন, কী করবো, যেখানকার যা হুকুম। --- আপনি ঐগানটা কী গান করলেন? --- বুঝতেই তো পারলেন কিছুই গাইলাম না। একটা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদবন্দনা করে নেমে চলে এলাম, এটা কি আর বাউল গান?

এটাই কিন্তু বাউলগান বলে চলছে। তার কারণটা কী ? এটাকে আমি বলি, আমাদের সামূহিক অজ্ঞতা। এবং, আমাদের যে-সিলেবাস ৰিবিদ্যালয় এবং অনার্স স্তরের, বাংলা পঠন-পাঠনের, অনেক সময়েই কাগজে বা সর্বত্র আলোচনা শোনেন যে আমূল পরিবর্তন করা দরকার --- আমার মনে হয় পরিবর্তনের আসল দিকটা কিন্তু এইটা। আমাদের দেশটাকে আমাদের জানা দরকার এবং এইদিক থেকে যদি আমরা আমাদের সিলেবাসকে পোক্ত করতে পারি , তাহলে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের বাইরে আমাদের নিজস্ব জীবনের ছন্দটাকে অ ামরা কিছুটা হয়ত বুঝতে পারি। তখন এই নকল-বাউল সাজা - বাউলদের ভিড় ক্রমশ কমে যাবে। গানকে তখন আর বাউলসুরে গেয় লিখে দেওয়া যাবে না। তখন প্রকৃত গানের সুরটা নির্দেশ করতে হবে আমাদের। গানগুলোকে সনাক্ত করতে হবে, গানের সুরগুলোকে স্বর লিপিবদ্ধ করতে হবে। সে প্রয়াস শু হয়েছে।

আমরা নিম্নবর্গের চেতনায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে কথাটা শু করেছিলাম। সেই কথাটায় আমাদের ফিরতে হবে। ফেরার কথাটা এই যে, তাদের জীবনের যে যাপনগত দিক, গ্রামের যে নিজস্ব দিক, সেখানে হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক স্বভাবতই স্বতঃ সিদ্ধ ভাবে মীম াংসিত। অমীমাংসিত নয়, কিন্তু, বিতর্কিতও নয়। তারা দিব্যি বেশ সুন্দর বেঁচে আছে নিজেদের মধ্যে । আমি দেখেছি. আজ থেকে দেড়শে া বছর আগে গুবির গোঁসাই বলে একজনের গান, তার গান ইসলামি অনুষঙ্গে ভর্তি। ভেবে আশর্চ্য হয়ে গেলাম যে একজন হিন্দু গায়ক কী করে এই ইসলামি গানলিখলেন ! আশর্চ্য হওয়ার কিছুই নেই, নজল যেরকম করে শ্যামাসঙ্গীত লেখেন, উত্তরটা হচ্ছে তাই। অর্থাৎ গায়কের মনের ভেতরে যে ভাবের জগৎ আছে, সেখানে যে মিলন মিশ্রণটা হচ্ছে আমরা গড়পড়তা হিসাবে সেটা মেলাতে পারিনা। তা এই যে ঘটনাটা যে, কুবির গোঁসাইর গানের মধে ইসলামি অনুষঙ্গ পেয়ে গেলাম, খোঁজ করতে করতে দেখলাম যে তখনকার গ্রাম এত স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে এত স্বাভাবিকতা ছিল --- একজন হিন্দু জানতো, মুসলমানদের তত্ত্বটা কী ? একজন মুসলমান জানতো হিন্দুদের তত্ত্বটা কী ? একটা আলোচনায় পড়ছিলাম যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমানের যে বড়ো হয়ে ওঠা, তার স্বাভাবিক অনুপাত ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে--- আমরা যারা হিন্দু, তারা হিন্দুধর্মটা খানিকটা জানি আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা খানিকটা জানি। ইসলাম সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জন্মসূত্রে ইসলামটাকে জানেন, পরিবেশসূত্রে হিন্দুটাকে জানেন, তার সঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষাটা তাঁরা পেয়েছেন।একজনমুসলমান তাই চেতনার দিক থেকে উন্নত। স্বীকার করতে হবে, তাদের একটা অন্যমাত্রা আছে, যেটা আমাদের নেই। নেই বলে সেটা অর্জন করার দিকে, আমাদের ঝোঁক নেই। সেটাকে আমরা সরিয়ে রেখেছি পাঁচশো বছরটাকে কেন আমরা অর্জন করবো না, সেটা কখনও আম াদের মনে জাগে নি। যদি জাগতো, যদি আমরা মুসলমানদের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হতাম, তাদের প্রত্যেকটি উৎসব প্রত্যেকটি রিচ্যুয় াল আমরা যদি জানতাম, একটা খাঁটি মুসলমানের লক্ষণ কী, মুসলমান ধর্ম ভেঙে কীভাবে ফকিরী ধর্ম গড়ে ওঠে যদি আমরা জানতে প ারতাম --- তাহলে আমাদের এই উভয়ের যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হতো একটা। আমরা বোধহয় অনেক সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্তরে

চলে যেতাম। তা না গিয়ে আমরা পারস্পরিক বন্ধুত্ব করছি বা অনেক সময়ে এরকমও কেউ কেউ মনে করেন এবং চীৎকার করেই বলেন, আমি গ খেয়েছি। এতে কিছু প্রমাণ হয়না। গ যিনি খাননি, তিনি কিন্তু অনেক বেশি ইসলাম হতে পারেন তাঁর চিন্তাচেতনার দিক থেকে। সেটা অসম্ভব কিছু না। সেইটার আমাদের খুব অভাব হয়ে গেছে। এবং আমিলক্ষ করে দেখি, যে, কাঙাল হরিনাথের মতো মানুষ যেরকম করে লালন ফকিরকে বুঝতে পেরেছিলেন, মীর মশার্‌রফকে বুঝতে পেরেছিলেন, সেভাবে আমরা বুঝতে পারিনি। পাশাপাশি জলধর সেন তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা তো পারলাম না। দীনেন্দ্রকুমার রায় পেরেছিলেন। কোথায় একটা শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে ভেদরেখা তৈরি হয়ে গেছে। আমরা কেন জানিনা, পৌনে দুশো বছরের ইংরেজী কালচারকে এতো মূল্য দিয়ে ফেললাম, পাঁচশো বছরের ইসলাম কালচারটাকে একদম বাদ দিয়ে দিলাম। সংকটের পথ একটাই। পরস্পরকে জানা।

শঙ্খদা-র যে কথা দিয়ে শু করেছিলাম -- সম্পর্ক নেই, তার আবার সম্প্রীতি কী ? --- আমাদের তৈরি করতে হবে আসলে একটা স ম্পর্ক। সেই সম্পর্কটা নিম্নবর্গে কায়েম আছে। উচচবর্গে কায়েম করতে পারলে, --- অন্ততলেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে,তণ ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে, যদি তাদের রচনাবলী পাঠ করানো যায়, ৰিবিদ্যালয়েতেযদি পাঠ্য করা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী শাক্ত পদাবলীর পাশাপাশি আমাদের লোকায়ত গানগুলিকে যদি আমরা চর্চা করতে পারি --- একটা মুক্তির পথ আসবে ।।

অনুলিখন দীপান্বিতা ঘোষ